প্রসূন।

উৎসর্গ।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" ॥

আমার

ইহ জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা

শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী বিশ্বাস

পিতৃদেব মহাশয়ের সুপবিত্র

শ্রীপাদপদ্মে

এবং

পরমারাধ্যা পরম পূজনীয়া

জননী দেবীর শ্রীচরণকমলে

এই ক্ষুদ্র প্রসূনটি

আন্তরিক ভক্তি সহকারে অর্পণ করিলাম।

সুখড়িয়া,
১১ই আশ্বিন, ১৩১০।

সেবক শ্রীভুজেন্দ্র

সূচী।

আষাঢ়ে গল্প।

(রত্ন-প্রদেশ)

বর্ষাকাল; সকাল হইতে ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে, ক্ষণকালের নিমিত্তও বিরাম নাই। রাস্তাঘাটে জনমানব অতিশয় বিরল, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৃহের বাহির হওয়া কাহার সাধ্য! এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীকে গৃহের বাহির হইতে বলাও

য়া, রণসাজে সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বলাও তাই। কেবল কলিকাতা সহরের রাস্তায় সখের-জলপান-ওয়ালা মাঝে মাঝে "চাই সখের জলপান সাড়েবত্রিশভাজা" হাঁকিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে অসার সংসারে যাহা একমাত্র সার পদার্থ তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য এরূপ অবস্থাতেও স্বীয় তুচ্ছ জীবন উপেক্ষা করিয়া রাজপথে অবতীর্ণ। এহেন সময়ে আমার সাথের সাথী পঞ্চমবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র নন্টুবাবু ধীরে ধীরে মৃদুমন্দগতিতে আমার পাঠ-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ভীমপরাক্রমে আমাকে আক্রমণ করিযা কহিলেন, "কাকাবাবু! একতা গল্প বল।" আমিত' আকাশ থেকে পড়িলাম! কোথায় Eastlynne খানি পড়িতে যাইতেছি, না— "কাকাবাবু একতা গল্প বল।" আমি বিস্তর আপত্তি প্রদর্শন করিলাম, কাকুতি মিনতি করিলাম; কিন্তু কে তা শোনে! সেই এক গৎ,— "কাকাবাবু একতা গল্প বল।" আমিও নাচার,

নন্দুবাবুও নাচার! নন্দুবাবুকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া দিদি কনকলতা সাক্ষাৎ মা রণচণ্ডীর বেশে হঠাৎ আসিয়া ধরিয়া বসিল,—"কাকাবাবু একটা গল্প বল। সত্যি কাকাবাবু তোমার দুটী পায়ে পড়ি একটা গল্প বল।" কি আর করি; আমি একা, উপায় নাই; কাজেই পরাজিত হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গল্প বলিতে বাধ্য হইলাম। তবে, কড়ার করাইয়া লইলাম যে মাঝে মাঝে "হুঁ", আর "তারপর" না বলিলে কিন্তু গল্প বলিব না।

অযোধ্যা প্রদেশে কোন এক সময়ে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন; তিনি তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড়ে চারিটী পুত্র-সন্তান জীবিত রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। ঐ রাজমহিষী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। তিনি তাহাকে বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদ, ভাল ভাল হস্ত্যশ্ব ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্য প্রদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি মাতার এতাদৃশ অত্যধিক স্নেহ দর্শনে ঈর্ষান্বীত হইয়া

মাতার ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা অন্য এক্‌টা স্বতন্ত্র বাটীতে তাঁহাদিগকে বাস করিতে দিয়া সমস্ত বিষয়-আশয় বিভাগ করিয়া লইলেন।

কনকলতা। তারা ত' ভারী দুষ্টু।

নন্টুবাবু। হ্যাঁ, কাকাবাবু তালা ভালী দুষ্টু।

ঐ কনিষ্ঠ রাজকুমার অত্যধিক প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িলেন। একদা তিনি তাঁহার মাতার সহিত নিকটবর্ত্তী গোমতী নদীতে স্নান করিতে গিয়া তথায় একখানি নৌকা দেখিতে পাইলেন। নৌকাতে কোন মাঝি বা দাঁড়ি ছিল না। অবশেষে রাজকুমার নৌকাতে আরোহণ করিয়া তাঁহার মাতাকে তাঁহার নিকট আগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার মাতা ইহাতে স্বীকৃতা না হইয়া বরং তাঁহাকেই নৌকা হইতে অবতরণ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রাজকুমার প্রত্যুত্তরে কহিলেন "না মা! আমি কখনই প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। আমি জলযাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছি; যদি আপনি আমার সহিত আগমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে

আসুন নতুবা আমি এই মুহূর্ত্তেই যাত্রা করিব।” এই বলিয়া তিনি নৌকা খুলিতে আরম্ভ করিলেন। রাজমহিষী যখন দেখিলেন যে রাজকুমার কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না, তখন তিনি অগত্যা নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনুকূল স্রোত পাইয়া নৌকাখানি তীরবৎ চলিতে লাগিল। বহুদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা সমুদ্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। সমুদ্র সন্দর্শনে তাঁহারা অত্যন্ত সুখানুভব করিতে লাগিলেন। চারিদিক জলাবৃত ; এক সীমা হইতে অপর সীমা দৃষ্ট হয় না। চতুর্দ্দিকেই কেবল অনন্ত জলরাশি ! সূর্য্য প্রায় অস্তমিত ; সূর্য্যকিরণ সমুদ্রজলে প্রতিবিম্বিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বিহঙ্গমগণ সমস্তদিন খাদ্য আহরণ করিয়া এখন নিজ নিজ কুলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। গগন মণ্ডলে দুই একটা নক্ষত্র দৃষ্ট হইতেছে এবং মারুতহিল্লোলে তরণী খানি নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু অবশেষে অকস্মাৎ তাঁহাদের মনে চিন্তা-মেঘ উদিত হইল। তাঁহারা এখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন এবং কোথায়ই বা যাইবেন। কিন্তু এখন আর ভাবিয়া কি হইবে ? “ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।”

সুতরাং সম্মুখ দিকেই অগ্রসর হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা একটী ঘূর্ণাবর্ত্তের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথায় রাজকুমার দেখিতে পাইলেন যে সমুদ্রের জলে কয়েকটা বৃহৎ উজ্জ্বল রত্ন ভাসিতেছে; তাহাদের প্রত্যেকটার মূল্য এত অধিক যে সাত রাজার ধন ব্যয় করিলেও একটাকে ক্রয় করা যায় না। রাজকুমার ছয়টা রত্ন নৌকার উপর তুলিয়া লইলেন; কিন্তু তাঁহার মাতা বলিলেন, "উহা আমাদের নয়; বোধ করি কোন জাহাজ এই স্থলে জলমগ্ন হইয়াছে। এই রত্ন তাহাদেরই, সুতরাং আমাদের ইহা লওয়া উচিৎ নয়। লোকে আমাদিগকে চুরী অপবাদ দিবে।" মাতার বার বার অনুরোধে রাজকুমার সেগুলিকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া মাতার অসাক্ষাতে একটা পরিচ্ছদের অন্তর্ভাগে বাঁধিয়া লইলেন। তৎপরে নৌকা খানিকে নিকটবর্ত্তী একটা বন্দরে লইয়া গিয়া তীরে অবতরণ করিলেন।

কনকলতা। তারপর?

ননুবাবু। তাল্‌পল্‌?

যে বন্দরে তাঁহারা উপনীত হইলেন উহা একটী প্রকাণ্ড সহর, অপর একজন পরাক্রমশালী নৃপতির রাজধানী। রাজবাটীর অনতিদূরেই সেই রাজমহিষী ও রাজকুমার একটা সামান্য কুটীরে আশ্রয় লইলেন। বালস্বভাবপ্রযুক্ত রাজকুমার মার্‌বেল্ খেলিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। দিবাবসানে যখন ঐ প্রদেশস্থ রাজপুত্রগণ রাজবাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানে ক্রীড়া করিতে আগমন করিতেন তখন আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত রাজকুমারও তাহাদের সহিত একত্রিত হইয়া ক্রীড়া করিতেন। তাঁহার একটাও মার্‌বেল না থাকায় তিনি সেই মাণিকটা লইয়া ক্রীড়া করিতেন। তত্রস্থ রাজকন্যা প্রত্যহ রাজ-প্রাসাদের বাতায়ন হইতে কুমারদিগের ক্রীড়া-কৌতুক দর্শন করিতেন। কিন্তু সে দিবস একটা অপরিচিত বালকের নিকট একটা অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিমান মাণিক দর্শন করিয়া ঐ মাণিকটী লইবার জন্য অতিশয় ইচ্ছুক হইলেন। তিনি তাহার পিতাকে কহিলেন যে, তিনি একটী অপরিচিত বালকের নিকট একটী অসামান্য মাণিক দেখিয়াছেন এবং তিনি সেই মাণিকটী লইতে ইচ্ছুক ইহাও তাঁহাকে বলিলেন নচেৎ তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। নৃপতি

তৎক্ষণাৎ তাঁহার দ্বারবানদিগকে সেই বালকটীকে মাণিক সমেত আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। যথাসময়ে রাজকুমার মাণিক সমেত রাজসভায় আনীত হইলেন। অনন্তর রাজা সেই মাণিকটী দর্শন করিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইলেন এবং ঐ মাণিকটী কোথায় পাইয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে রাজকুমার কহিলেন, "ইহা আমি সমুদ্রে পাইয়াছি।" রাজা সেই মাণিকটীকে দুই সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রাজকুমার উক্ত রত্নের প্রকৃত মূল্য অজ্ঞাত থাকায় ঐ প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তিনি দুই সহস্র মুদ্রা লইয়া বাটী প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মাতা ঐ টাকা লইতে অস্বীকার করিলেন, যেহেতু তিনি মনে করিলেন যে, রাজকুমার কোন অসদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ অর্থ আনয়ন করিয়াছেন। রাজকুমার তাঁহার মাতাকে এই বলিয়া আশ্বাসিত করিলেন যে, "আমি উহা চুরি করি নাই; আমি সমুদ্র হইতে একটী রত্ন আনয়ন করিয়াছিলাম, সেটীকে রাজা কিনিয়া লইয়াছেন।"

কনকলতা। তার পর?

ননুবাবু। তাল্ পল্?

ঐ রাজকন্যার একটী শুকপক্ষী ছিল। সেটীকে যাহা জিজ্ঞাসা করা হইত সে তাহার প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিত। রাজকন্যা কেশের শোভা সম্পাদনের জন্য রত্নটী বেণীতে সংলগ্ন করিয়া একদিন শুকপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

প্রিয়তম শুক তোমা' বড় ভালবাসি,
আমার নিকটে তুমি সদাই বিশ্বাসী,
দেখ দেখি শুকপক্ষী দেখ একবার
পূর্ণশশী দীপ্ত যেন ললাটে আমার
মস্তকে রত্নটী মোর শোভিছে কেমন !
ফণীর মাথায় মণি দেখায় যেমন।
সত্য করি' বল শুক বল একবার
শোভিতেছে এই অঙ্গ কিবা চমৎকার ?

'চমৎকার ! নাহি জানি কেমন বিচার !'
হাসিয়া বলিল শুক বাঁকাইয়া গ্রীবা—
'কি বলিব রাজকন্যা, বলিলে প্রকৃত কথা
পাইবে হৃদয়ে তুমি বড়ই বেদনা।
জানিতে আমার মত বাসনা ক'রেছ তুমি

পুরাব সে বাসনা অচিরাৎ ;
কিন্তু ভয় হয় পাছে ঘটে হিতে বিপরীত।
শুন তবে রাজবালা শুন হে বচন
'পরিয়া একটা রত্ন গর্ব্বিত হ'তেছ বৃথা ;
দেখি নাই কভু আমি, শোভিতে একটী রত্ন
রাজকুমারীর শিরে, এ বিশ্ব জগতে
দ্বিরত্নই শোভা পায় রাজবালাদের মাথে !
উচিৎ তোমার পক্ষে করিতে শোভন বেণী
দুটী রত্ন দিয়া
দেখিতে হ'য়েছ তুমি বড়ই কুৎসিত
পরিয়া একটী রত্ন
ঈদৃশ কুরূপ আমি দেখিনাই কভু।'

কনকলতা। হ্যাঁ কাকাবাবু পাখীতে কি কখনও কথা কহিতে পারে ? তাতে আবার পদ্যতে !

নন্তুবাবু। হ্যাঁ কাকাবাবু পাখীতে কথা বল্‌তে পালে ? তাতে আবা—

আমি। হাঁ পারে। সে কালের পাখী কিনা!

কনকলতা। আচ্ছা তার পর?

নন্টুবাবু। আথা তাল্ পল্?

শুকপক্ষীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূতা হইয়া প্রাসাদের শোকাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অন্ন জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন না। এদিকে রাজা যখন শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার দুহিতা অনাহার অবস্থায় শোকাগারে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, তখন তিনি অধৈর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসিবার নিমিত্ত কন্যার নিকট আগমন করিলেন। রাজকন্যা পিতাকে সবিশেষ বর্ণনা করিলেন, অধিকন্তু কহিলেন, "পিতঃ, আপনি যদি আমাকে আর একটী মাণিক আনাইয়া দিতে না পারেন তাহা হইলে আমি আপনার সম্মুখে নিশ্চয়ই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া আর একটী রত্ন আনয়নের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন, এবং

যে বালকটীর নিকট প্রথমোক্ত রত্নটী ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাকেও আনয়ন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাকে যে একটী রত্ন বিক্রয় করিয়াছ, তাহাতে আমি বড়ই উপকৃত হইয়াছি; যদি তুমি সেইরূপ আর একটী আনয়ন করিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি তোমার সহিত আমার দুহিতার বিবাহ দিব ও অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিব।" রাজকুমার পুরস্কার প্রলোভানে প্রলোভিত হইয়া নৃপতির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমুদ্র গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অনন্তর রাজকুমার গৃহে প্রত্যাগত হইয়া মাতাকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু পুত্রবৎসলা জননী অত্যন্ত ভীতা হইয়া কিছুতেই এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু রাজকুমার সমুদ্রযাত্রায় কৃতসংকল্প হইয়াছেন—কিছুতেই নিষেধ মানিলেন না। তিনি একাকী তাঁহার সেই ক্ষুদ্র নৌকাখানি লইয়া সমুদ্র যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল মধ্যে পুনরায় সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে উপস্থিত হইলেন। এবং পূর্ব্বের ন্যায় কয়েকটী রত্ন ভাসিতে দেখিলেন; কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মনে অন্য একরূপ ভাবের উদয় হইল। তিনি এই সকল রত্ন কোথা হইতে আসিতেছে ও তাহা-

দের আদি বা অন্ত কোথায় ইহা জানিবার নিমিত্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। ক্রমে তিনি ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে দুইধার হইতে দুইটী জলধারা মধ্যস্থল ভেদ করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হইতেছে। তাঁহার কৌতূহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইল এবং তিনি নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্থানে ডুব দিলেন; নৌকাখানিও আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তৎপরে যাহা দর্শন করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য ও বর্ণনাতীত! দেখিলেন, জলমধ্যে একটী প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী; বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে সারস, ময়ূর, রাজহংস প্রভৃতি কতশত পক্ষী বিচরণ করিতেছে; দ্বারদেশে দুইটী শশক বিরাজিত, দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহারাই দ্বারবান,—সযত্নে দ্বাররক্ষা করিতেছে। বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে একটী সোপান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে হয়; সেই সোপানের উর্দ্ধভাগে একটী স্বর্ণনির্ম্মিত পিঞ্জরে একটী কোকিল সুমধুর স্বরে গীত গাহিতেছে। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিম্নকার সমস্ত গৃহগুলি দর্শন করতঃ দ্বিতলস্থ একটী ঘরে প্রবেশ করিলেন। তথায় গমন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত

হইলেন। কিন্তু তথাপি সাহসে ভর করিয়া সমুদায় পর্য্য-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই গৃহমধ্যে একজন শ্বেত-কায় মহাপুরুষ নিমীলিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহার মস্তকের কয়েক হস্ত ঊর্দ্ধে একটী কাষ্ঠাসনে এক পরমাসুন্দরী কন্যা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। কাষ্ঠাসনটা কিছু দূরে ছিল বলিয়া কন্যাটীকে স্পষ্টরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিলনা। সেই কাষ্ঠাসনে উঠিবার একটা সোপান ছিল। রাজকুমার সেই সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেন; কিন্তু তৎপরে যাহা দর্শন করিলেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দেখিলেন, কন্যাটীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন। মস্তকটী ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে দুইটী রক্তধারা উত্থিত হইয়া একটী ভূমিস্থিত মস্তকে এবং অপরটী ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষটীর মস্তকে পতিত হইয়া রত্নাকারে সমুদ্রে যাইয়া মিশিতেছে। ঐ কন্যাটীর সন্নিকটে দুইটী কলম রহিয়াছে; তন্মধ্যে একটা স্বর্ণ ও অপরটা রৌপ্যনির্ম্মিত। রাজকুমার কৌতূহলী হইয়া কলম দুইটী লইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হঠাৎ স্বর্ণ-নির্ম্মিত কলমটী তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিস্থিত মস্তকে পতিত হইবামাত্র মস্তকটী কন্যাটীর

দেহে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল এবং তৎসঙ্গে কন্যাটীও জীবিতা হইয়া রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি এস্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন করুন; কারণ ধ্যানমগ্ন পুরুষটী ধ্যানভঙ্গ হইলেই কোপানলে আপনাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন; সেই জন্য বলিতেছি যে যদি আপনি বাঁচিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই রৌপ্য-নির্ম্মিত কলমটী আমার গাত্রে স্পর্শ করাইয়া এই মুহূর্ত্তেই এস্থান হইতে প্রস্থান করুন।" রাজকুমার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "আমি এস্থান হইতে একাকী প্রত্যাগমন করিবনা; তুমি আমার সহিত আগমন কর, আমরা দুই-জনে পলায়ন করি।" অবশেষে উভয়েই পরামর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে রাজকুমার ১৭টী রত্ন তাঁহার বস্ত্রের অন্তর্ভাগে বন্ধন করিয়া লইলেন এবং উভয়েই উপরিস্থিত নৌকায় আরোহণ করিলেন। অবশেষে তাঁহারা যথা সময়ে তাহাদের নিরূপিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও দেবকন্যাটীকে দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করি-লেন। তৎপর দিবস প্রাতে রাজকুমার পাঁচটী রত্ন রাজ-বাটীতে প্রেরণ করিলেন। রাজা ও রাজকন্যা রত্নকয়টী

প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। শীঘ্রই রাজকুমারের সহিত রাজকন্যার ও দেবকন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। তৎপরে রাজকুমার স্বদেশ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, রাজা বহু সংখ্যক লোক জনের সহিত তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। রাজকুমারের জননীও পুত্রবধূদিগের মুখ দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

আমি। কেমন কনক, গল্প শোনার আশা মিট্‌লত' ?

কনক। হ্যাঁ কাকা বাবু মিট্‌ল'।

আমি। তুমি কি বল নন্নু বাবু ?

আর নন্নুবাবু! নন্নুবাবুর তখন অর্দ্ধেক রাত্রি।

(১১ই ফাল্গুন ১৩০৬ সাল।)

শশিভূষণ।

(ভৌতিক গল্প)

শশিভূষণ দরিদ্র বলিয়া, পৃথিবীতে বৃদ্ধা জননী ভিন্ন আপনার বলিবার আর কেহই নাই। তাহার বন্ধু নাই, জ্ঞাতি নাই, তাহার দুঃখে একটু সহানুভূতি প্রকাশ করে এমন লোক কেহই নাই। এজগতে যাহার অর্থ নাই তাহার কেহই নাই!

শশিভূষণের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকপুর গ্রামে। তাহার পিতা হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেন। তাঁহাদের সংসার বেশ সচ্ছলভাবে চলিত। গ্রামে তাঁহার যথেষ্ট মান সম্ভ্রম ছিল; লোকে তাঁহাকে খুব

শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তিনি জীবদ্দশায় বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কালের প্রবাহ কেহ রোধ করিতে পারে না। দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় আবার দিন আসে। ক্রমে হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় পীড়িত হইলেন। একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়া ১৪।১৫ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কৈ তাঁহার ত' রোগের কিছুই উপশম হইল না? বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। ভালরূপ চিকিৎসা করাইবার নিমিত্ত দেশ বিদেশ হইতে চিকিৎসক আনয়ন করা হইল, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। চিকিৎসকেরা হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ও প্রতিবাসীদিগের অনুমতিক্রমে শশিভূষণ পিতাকে গঙ্গাতীরস্থ করিল। ক্রমে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মুমূর্ষু অবস্থা সন্নিকট হইতে লাগিল; তিনি অতি নিকট সম্পর্কীয় জনৈক আত্মীয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই, আমিত' চলিলাম! শশিভূষণ শিশু; সংসারের বিষয় সে কি জানে? ভাই, এ সময়ে যদি তোমরা তাহাকে না দেখিবে তাহা হইলে আর কে দেখিবে? তোমরা যদি না দেখ, তাহা হইলে সেই অবোধ শিশুকে অকালে প্রাণ হারাইতে হইবে।" এই বলিয়া শশিভূষণকে

ডাকিয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শশিভূষণ তখন অদূরে জানুর উপর বদনমণ্ডল ন্যস্ত রাখিয়া ক্রন্দন করিতেছিল ও পিতা যে সকল উপদেশ শিক্ষা দিয়াছেন তাহার বিষয় চিন্তা করিতেছিল।

যে ভদ্র লোকটীর উপর শশিভূষণের পিতা শশিভূষণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিলেন, তাঁহার নাম শ্রীরাজীবলোচন চট্টোপাধ্যায়; গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটীর অনতিদূরেই তাঁহার বাস। রাজীব-লোচন, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পর্কে ভ্রাতা এবং প্রতিবেশী। শশিভূষণ তাঁহাকে 'কাকা' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশানুযায়ী রাজীব শশিভূষণকে ডাকিবার জন্য গমন করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই শশিভূষণের সহিত প্রত্যাগমন করিল।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকে সস্নেহে কহিলেন, "বৎস! আমার এখন বেশী কিছু বলিবার সামর্থ্য নাই, শীঘ্রই আমাকে তোমাদের মায়া কাটাইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে। মৃত্যুকালে তোমাকে রাজীবলোচনের করে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি; দেখ' বৎস, যেন কখনও তাহার অবাধ্য হইওনা, তাহার

আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না ; বিনয় ও শিষ্টাচার শিক্ষা করিবে, শত্রুদিগকে ভাল বাসিবে এবং যে তোমাকে ঘৃণা করে, তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিবে ; ভ্রম ক্রমেও কুপথে অগ্রসর হইও না। আশীর্ব্বাদ করিতেছি আয়ুষ্মান্ হও।” পরে রাজীব লোচনকে কহিলেন, “ভাই, এখন শশিভূষণের জীবন মরণের দায়ী তুমিই রহিলে। দেখ’ ভাই, যেন তাহাদিগকে কোনরূপে কষ্ট পাইতে না হয়। আমি চলিলাম। আমাকে একটু গ—ঙ্গা—জ—ল।” রাজীব-লোচন মুখে জল দিলেন ; তখন একটু প্রকৃতস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি যে অর্থ রাখিয়া যাইতেছি, তাহার অর্দ্ধেক হইতে এই জাহ্নবীতটে একটি অতিথিশালা স্থাপন করিবে। আমার জীবদ্দশায় স্থাপন করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি নাই। আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে, আর কিছুই বলিবার শ—ক্—তি—” বলিতে বলিতে তিনি চক্ষু মুদিলেন। শশিভূষণ কত ডাকিল, কত কাঁদিল, কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কিছুই শুনিতে পাইলেন না। তিনি তখন ইহ সংসারের মায়া কাটাইয়া, যথায় ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, ব্যথা নাই,

যন্ত্রণা নাই, জরা নাই, ব্যাধি নাই, ঈদৃশ জগতে গমন করিয়াছেন।

যথাসময়ে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ক্রমে শ্রাদ্ধ নিকটবর্ত্তী হইল। বহু ঘটা করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল, দেশ বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইল, দীন দরিদ্রদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করান হইল। শ্রাদ্ধে বহু অর্থ ব্যয় করা হইল।

রাজীবলোচন শশিভূষণের অভিভাবক হইয়া প্রায় দেড় বৎসর তাহাদিগকে প্রতিপালন করিল। কিন্তু এত টাকা হাতে পাইয়া কিছুতেই লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। ক্রমে তাহার মনে দুষ্ট বুদ্ধি আসিল। সে, একদিন শশিভূষণকে প্রকাশ্যভাবে কহিল, "গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রাদ্ধে সে সমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে, আমারও সময় এখন ভাল নয়, সুতরাং আমি আর তোমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিতেছিনা। তুমি কিছু ছেলেমানুষ নও, চাকুরী করিবার বয়স তোমার হইয়াছে; সুতরাং কোন স্থানে চাকুরীর চেষ্টা কর।" রাজীবলোচনের বাক্যে শশিভূষণের প্রাণে বড়ই আঘাত

লাগিল ; সে তাহার মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া চাকুরীর চেষ্টায় বহির্গত হইল এবং অনেক অনুসন্ধানের পর মাসিক বার টাকা বেতনে একটী চাকুরী পাইয়া কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা ‘কুলীন’ নহেন, তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে হইলে বহু অর্থ যৌতুক স্বরূপ কন্যাকর্ত্তাদিগকে দিতে হইত। আমাদের শশিভূষণ ‘কুলীন’ শব্দধারী ছিলন। বলিয়া তাহার এতৎকালাবধি বিবাহ হয় নাই। কিন্তু এখন তাহার মাতা, বিবাহ দিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শশিভূষণ অনেক ওজর আপত্তি করিল, বহু কারণ দেখাইল কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। কাজেই শশিভূষণ সম্মত হইয়া কহিল, “আমি অন্য বিদেশে গমন করিব। বিবাহের উপযুক্ত অর্থ যতদিন না উপার্জ্জিত হয় ও একটী ভাল চাকুরী যতদিন না প্রাপ্ত হই, ততদিন বাটী আসিব না, আশীর্ব্বাদ করুণ যেন সফল মনোরথ হইয়া শীঘ্রই আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাই।” মাতা আর কি করিবেন! বিমর্ষ হৃদয়ে সজলনেত্রে পুত্রকে বিদায় দিলেন।

শশিভূষণ মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বাটী হইতে রওনা হইল।

শশিভূষণের বাটীর সন্নিকটে একটী অশ্বত্থবৃক্ষে এক ভূত বাস করিত। যে দিবস শশিভূষণ বাটী হইতে গমন করিল সে দিবস সন্ধ্যার সময় ঐ ভূত শশিভূষণের আকার ধারণ করিয়া তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শশি-ভূষণের মাতা উহাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "ইহার মধ্যে তুমি ফিরিয়া আসিলে কেন? পথে কোন অমঙ্গল ঘটে নাইত'?" ভূত কহিল, "না, মা! কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। তবে, ও পাড়ার শিরোমণি মহাশয় কহিলেন যে অন্ত হইতে দুই বৎসরের মধ্যে বিবাহের দিন নাই, অকাল পড়িয়াছে। সেই কারণ আপাততঃ অর্থ উপার্জ্জনের কোন আবশ্যক বোধ করিলাম না; তদ্ভিন্ন এই দেশের রাজপুত্রের অন্নপ্রাশনে, রাজার নিকট উপহার স্বরূপ এই অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই বলিয়া কতকগুলি রজতমুদ্রা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। শশিভূষণের মাতারও কোনরূপ সংশয় উপস্থিত না হওয়াতে সে তথায় সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। শশিভূষণের আকৃতির সহিত ভূতের আকৃতির কোনরূপ

পার্থক্য না থাকায় প্রতিবেশীগণও কোনরূপ সংশয় করে নাই।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, শশিভূষণ বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া বাটী আসিল। বাটীতে প্রবেশ করিয়াই নিজের মত অপর একটী ব্রাহ্মণকে উপবিষ্ট দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইল। কিন্তু সে কিছু বলিতে না বলিতেই ভূত কহিল, "তুমি কে হে? আমার বাটীতে তোমার কি দরকার?" প্রত্যুত্তরে শশিভূষণ বলিল, "আমি কে' জিজ্ঞাসা করিতেছ? প্রথমে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? এই বাটীত' আমার এবং এইত' আমার মাতা।" ভূত কহিল, "কি আশ্চর্য্য! সকলেই জানে এই আমার বাটী, এই আমার মা এবং আমি এই বাটীতে চিরকাল বাস করিতেছি, আর আজ তুমি বলিতেছ এই সকলই তোমার! বেশত' মজা! এরকম কথা আর কাহারও নিকট বলিও না, লোকে গায়ে ধূলা দিবে। তোমার মাথা গরম হইয়াছে দেখিতে পাইতেছি।" এই বলিয়া ভূতটা উহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শশিভূষণ ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অবশেষে রাজার নিকট নালিশ করিবে স্থির করিয়া রাজবাটী অভিমুখে যাত্রা করিল। যথাকালে রাজার নিকট নালিশ উত্থাপিত হইলে তিনি শশিভূষণ-বেশী ভূতকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত শমন পাঠাইলেন। এবং লোক সহিত ভূতও রাজবাটীতে আগমন করিল। রাজা, দুইজনকেই একরকম দেখিয়া কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, তৎপরদিবস আগমন করিতে আদেশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলেই উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দিবসও রাজা কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে প্রত্যহই 'তৎপর দিবস' আসিবার জন্য আদেশ করিতেন, এবং ব্রাহ্মণও প্রত্যহই ভগ্নহৃদয়ে প্রস্থান করিতে করিতে বলিত, "কলির সকলই বিপরীত; যাহার গৃহ, ধন আছে, সে ভোগ করিতে পাইবে না, অপর একজন সেই সমস্ত ভোগ করিবে। এ দেশের রাজাও ইহার মীমাংসা করিবেন না, এ স্থানে থাকাই অন্যায়।" ইহা বলিতে বলিতে, ব্রাহ্মণ প্রত্যহ একটী প্রান্তরের নিকট দিয়া গমন করিত। সেই প্রান্তরে রাখাল বালকেরা গোরু চরাইতে আসিত। মধ্যাহ্ন সময়ে যখন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, যখন গ্রামের অধিকাংশ লোকই সুষুপ্ত, এমন কি বোসেদের মেনি বিড়ালটা পর্য্যন্ত

ক্ষুদ্র টেবিলটার নীচে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যাইত, তখন এই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে কেবল কয়েকটী রাখাল-বালকই কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। তাহারা প্রত্যহ নিজ নিজ গো, মেষ প্রভৃতিকে স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া নিকটবর্ত্তী জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিত। তাহাদের ক্রীড়া অভিনয় বড় চমৎকার। তাহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাকে রাজা করিত, কেহ মন্ত্রী, কেহ পারিষদ্, কেহ অমাত্য, কেহ সেনাপতি প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া নিয়মিতরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। কেহ চোর সাজিল, তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইল। এইরূপে তাহারা মধ্যাহ্ন যাপন করিত। কিন্তু কয়েকদিন হইতে একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণকে তাহাদের রাজসভার নিকট দিয়া "এ দেশের রাজার কি অবিচার" বলিয়া গমন করিতে দেখিতে পাইতেছে। প্রত্যহই ইহা শ্রবণ করে, এবং ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে তাহাদের কাল্পনিক রাজসভায় একথার উত্থাপন করিয়া ইহার কারণ কি জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়। একদিন রাখাল-রাজা স্থির করিল যে, কল্য সেনাপতি, ব্রাহ্মণটীকে রাজসভায় ডাকিয়া আনিবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে, নিয়মিত

সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ প্রকৃত রাজসভা হইতে ভগ্নহৃদয়ে প্রান্তর-পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় 'সেনাপতি' উপাধীধারী বালকটা আসিয়া বলিল, "রাজা তোমাকে ডাকিতেছেন, তোমাকে যাইতে হইবে চল।" ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কেন? আমি ত' এই রাজার নিকট হইতে আসিতেছি। আবার ডাকিতেছেন কেন?" বালকটী কহিল, "তোমাকে 'আমাদের' রাজা ডাকিতেছেন, আমাদের রাখাল-রাজা, বুঝিলে,—বিলম্ব করিও না চল।" ব্রাহ্মণ বলিল, "রাখাল-রাজা কে?" সে কহিল, "আসিলেই দেখিতে পাইবে।" ব্রাহ্মণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সহিত রাখাল-রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাখাল-রাজা জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্মণ! তুমি প্রত্যহ ক্রন্দন করিতে করিতে যাও কেন?" শশিভূষণ তাহাকে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে রাজা কহিল, "আমি তোমার সমস্তকথা বুঝিয়াছি; আমি তোমাকে বাটী, ঘর, দ্বার পুনরায় ফিরাইয়া দিব, তুমি কেবল দেশের রাজার নিকট যাও এবং তাঁহাকে বলিয়া আইস যে, 'এই গ্রামের প্রান্তর্ভাগে এক প্রান্তরে রাখাল বালকেরা একটী রাজসভা করিয়াছে, তাহারা আমার বিচার করিবে; কেবল আপনার আদেশের

প্রতীক্ষায় আছে'।" ব্রাহ্মণ যাইয়া রাজাকে সমস্তই কহিল, রাজা শুনিয়া সহাস্যমুখে মত দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণও যথাসময়ে প্রত্যাগমন করিয়া রাখাল-রাজাকে কহিল যে, তিনি মত দিয়াছেন। রাখাল-রাজা কহিল, "আগামী কল্য প্রাতঃকালে তোমার বিচার হইবে।" ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল। রাখাল-রাজা তখন একজন কর্ম্ম-চারীকে ভূতের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে তৎপরদিবস উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দি সময়ে, সকলেই ঐ প্রান্তরে উপস্থিত হইল। এমন কি রাজাও তাঁহার পারিষদ্বর্গের সহিত এই অপূর্ব্ব বিচার শ্রবণ করিবার ইচ্ছায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাখাল-রাজা বাটী হইতে একটী কুঁজো (জলপাত্র) লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সকলের মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। রাজা, তাহার নির্ভীক চিত্ত, উন্নত ললাট দর্শনে আনন্দিত হইলেন। রাখাল-রাজা স্বস্থানে উপবেশন করিয়া একে একে উভয়ের জবানবন্দী শ্রবণ করিয়া কহিল, "বেশ! আমি সবই শুনিলাম; এইবার বিচার করিব।" একটু থামিয়া কুঁজোটা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এই যে কুঁজোটা দেখি-তেছ, তোমাদের মধ্যে যে ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে

পারিবে, বাটী, ঘর, দ্বার প্রভৃতি সমস্তই তাহার হইবে; এখন কে প্রবেশ করিতে পার দেখি?" ব্রাহ্মণ শ্রবণ করিয়া কহিল, "তুমি চাষা, তোমার বুদ্ধিও চাষা; ইহার ভিতরে কি কেহ প্রবেশ করিতে পারে? যা নয় তাই!" রাখাল-রাজা কহিল, "যদি তুমি না প্রবেশ করিতে পার তাহা হইলে তুমি প্রকৃত স্বত্বাধিকারী নও।" ইহা বলিয়া শশিভূষণ-বেশী ভূতের দিকে ফিরিয়া কহিল, "তুমি কি বল, পারিবে?" ভূত ইহা শুনিয়া সানন্দে কহিল, "নিশ্চয়ই পারিব। আমিই হ'চ্চি প্রকৃত স্বত্বাধিকারী, আমি আর পারিব না!"—বলিয়া একটী ক্ষুদ্র মক্ষিকার আকার ধারণ করিয়া কুঁজোর ভিতরে প্রবেশ করিল। সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রাখালরাজা তৎক্ষণাৎ কুঁজোটীর মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে কহিল, "যাও, তোমার বাটী, ঘর, সংসার লইয়া সুখে সচ্ছন্দে বাস করগে এবং এই কুঁজোটাকে সমুদ্রের অতল জলে নিক্ষেপ করিও।" প্রকৃত-নৃপতি রাখালবালকদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। সমবেত লোকবৃন্দ জয়ধ্বনি করিয়া প্রান্তরভূমি বিকম্পিত করিতে লাগিল। কোলাহল একটু নিবৃত্ত হইলে রাজা সমবেত লোকবৃন্দকে মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "অদ্য হইতে আমরা

শিক্ষালাভ করিলাম যে ছোটলোক বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করা উচিৎ নয়। যে বিচার আমিও করিতে পারি নাই, তাহা, এই সামান্য রাখাল বালকেরা সচ্ছন্দে মীমাংসা করিয়া দিল। আমি ইহাদিগকে মাসিক কিছু কিছু দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।" পুনরায় সেই প্রান্তরভূমি কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি উঠিল। শশিভূষণ ও অন্যান্য সকলে বালকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল। শশিভূষণ বাটী প্রত্যাগমন করিয়া তাহার মাতাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে বৃদ্ধামাতা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, "বাছা, তোকে আর কখনও বিদেশে যাইতে হইবে না। দেশে আমরা না খাইয়া মরি সেও ভাল, তথাপি আর কখনও বিদেশে চাকুরী করিতে যাইতে দিব না।" কিছুদিন পরে শশিভূষণের মাতা পছন্দ করিয়া কোন প্রতিবেশিনীর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে পাকস্পর্শে শশি-ভূষণ সেই রাখালবালকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।

(১১ই মাঘ, ১৩০৭।)

"ঈশ্বর যাহা করেন সকলই মঙ্গলের জন্য"

গ্রীষ্মকাল—জ্যৈষ্ঠমাস। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ভাস্করদেব প্রখর তেজে কিরণজাল বিস্তার করতঃ মানবগণকে "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছেন। ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়াগিয়াছে; কিন্তু সূর্য্যদেব এতই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন যে বৃষ্টির শীতলত্ব অপহরণ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে উষ্ণতা দান করিতেছেন। গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ অনেকেই দিবানিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। কেবল গ্রামস্থ ২।৪টী বালক পুষ্করিণীর জলে সন্তরণ পূর্ব্বক গাত্রজ্বালা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। অন্যান্য বালকগুলি আম্র-

কাননে আম্রভক্ষণে ইচ্ছুক হইয়া ছুরিকা হস্তে বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া রহিয়াছে। বিহঙ্গমগণ খাদ্য আহরণে বিরত হইয়া স্ব স্ব কুলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। গবাদি পশুগণ ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে; গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তাহারা কোন স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। বৃক্ষপত্রগুলি নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে,—কিছুমাত্র নড়িতেছে না। সমীরণ তাহাদের নিকট পরাজিত হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিয়াছে। এহেন সময়ে কোন এক পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ পথ দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক দুইটি শিশুসন্তান সঙ্গে লইয়া গমন করিতেছে। তদ্ভিন্ন রাস্তায় অপর জন-মানব দৃষ্ট হয় না। বিধবা দরিদ্রা। প্রত্যহ পর্ব্বতে কাষ্ঠান্বেষণে গমন করে। সেই কাষ্ঠ বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পায় তদ্দ্বারাই কোন রকমে স্বীয় সন্তান দুইটির ও আপনার প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে। আজিও কাষ্ঠানুসন্ধানে গমন করিতেছে। পাঠকগণ, যদি দারিদ্র্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, যদি দরিদ্রদিগের দারুণ দুর্ভাবনা বশতঃ কুঞ্চিত ললাট দর্শন করিতে চাও, যদি দরিদ্রদিগের হৃদয়-গ্রাহী কষ্ট অনুভব করিতে চাও, যদি দরিদ্রদিগের জন্য

এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতে চাও, তাহা হইলে ঐ রৌদ্রতাপিত পথশ্রান্ত বিধবা রমণী ও তাহার শিশুসন্তান-দ্বয়কে নিরীক্ষণ কর।

সন্তান দুইটির মধ্যে একটী নবমবর্ষীয় বালক ও অপরটী সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা। বালক বালিকা দুইটি পরস্পর পরস্পরকে অতিশয় ভালবাসে—তাহারা যেন একবৃন্তে দুটি ফুল! তাহারা ধীর ও শান্ত। তাহারা এই বয়সেই তাহাদের সাংসারিক অবস্থা সম্যকৃরূপে বুঝিয়াছে, সে কারণ কখনও কোনও দ্রব্যের জন্য আব্দার করে না। তাহারা পাপকার্য্যে ঘৃণা করে ও প্রতিদিন পরম পিতা পরমেশ্বরকে আরাধনা করে।

ক্রমে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিল। সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে বহুকালের পুরাতণ ও ধ্বংসাবশেষ একটি মন্দির ছিল। মাতা, পুত্র দুইটিকে বলিলেন, "বৎস! এখানে কত ছোলার গাছ রহিয়াছে দেখ! তোমরা এই স্থানে বসিয়া খেলা কর এবং ইচ্ছামত ছোলা লইয়া খাও; আমি ঐ মন্দিরের পার্শ্ব হইতে কাষ্ঠ কাটিয়া লইয়া আসিতেছি।" ইহা বলিয়া মাতা প্রস্থান করিলেন। শিশু দুটি আপন মনে ছোলা

খাইতে ও গল্প করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকাটী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে পুত্র-বৎসলা জননীর হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল ও মন বড়ই আকুল হইল। জননীর স্নেহের মহিমা অপার! যে অভাগা সেই স্নেহে বঞ্চিত তাহার জীবনই বৃথা। মাতা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের নিকট ছুটিয়া আসিয়া ভয়বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে?" বালিকা কহিল, "দেখ মা, একটা কতবড় সাপ। আর একটু হইলেই আমাকে কামড়াইয়াছিল!" ইহা শুনিয়া বালকটী উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, "ভয় কি? উহা সাপ নয়।" পরে মাতার দিকে ফিরিয়া বলিল, "না মা, ওটা সাপ নয়, ওটা একটা গিরগিটি মাত্র। ও গিরগিটিকে সাপ মনে করিয়াছে।" মাতা দেখিলেন যে বালকটী ঠিক্ বলিয়াছে; বস্তুতঃ উহা গিরগিটি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এমন সময়ে ভয়ানক শব্দ করিয়া ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। মাতা ও শিশু দুইটি অত্যন্ত ভীত হইল এবং দেখিল যে, যে মন্দিরে মাতা কাষ্ঠান্বেষণে গমন করিয়াছিলেন সেই মন্দিরটীকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ধূলিশায়িত করিয়া ভূমিকম্প শেষ হইল। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সন্দর্শন করিয়া সকলে যুগপৎ বিস্মিত ও

আনন্দিত হইল এবং মাতা, পরমপিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস!

"ঈশ্বর যাহা করেন সকলই মঙ্গলের জন্য"।

অদ্য তোমরা গিরগিটিটাকে না দেখিলে এতক্ষণ আমি মন্দির চাপা পড়িতাম ও তোমরা মাতৃহীন হইতে!"

(বৈশাখ ১৩০৮।)

বাটীর কর্ত্তা।

(ভৌতিক গল্প)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিলাম। পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিয়াছি বলিয়া সকলেরই আন্তরিক যত্ন ও আদর প্রাপ্ত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে আমার প্রশংসা অহর্নিশি লাগিয়া থাকিত। যে গ্রামে আমাদিগের বাস, সে গ্রাম নিতান্ত পল্লী; সুতরাং তথায় 'মা সরস্বতীর' সহিত কাহারও বড় একটা সদ্ভাব ছিলনা। আমিই সেই গ্রামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তদ্ভিন্ন, গ্রামের মধ্যে আমরাই বর্দ্ধিষ্ঠ সম্পন্ন লোক। পিতার বিস্তর নগদ টাকা ও জমিদারী, এই সমস্ত কারণে তত্রস্থ

সকল লোকেই বলিত যে হরিশপুরের চৌধুরীদের গৃহে 'মা সরস্বতী ও লক্ষ্মী' উভয়েই বাঁধা আছেন।

আমরা দুই ভাই। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাণপুরে কণ্ট্রাক্টরীর কার্য্য করিয়া মাসে ২।৩ শত টাকা উপার্জ্জন করেন ও সপরিবারে সেই স্থানেই বাস করেন। হরিশ-পুরে কেবল আমার পিতাঠাকুর মহাশয় ও মাতাঠাকুরাণী থাকেন। পিতা আমাকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পটলডাঙ্গায় একটি ত্রিতল বাটী ভাড়া করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমি কলিকাতায় হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করি ও সেই স্থান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছি। বাসায় থাকিবার মধ্যে একজন পাচক, একটি ভৃত্য এবং আমাদিগের বহু-কালের পুরাতন বিশ্বস্ত গোমস্তা যদুনাথ। যদুনাথ আমাদিগের বাটীতে প্রায় ত্রিশ বৎসর চাকুরী করিতেছেন। সুতরাং কলিকাতার বাসায় তিনিই আমার অভিভাবক। আমি তাঁহাকে যথা সম্ভব মান্য করিয়া চলি। আমি হরিশ-পুরে বৎসরে দুইবার যাই—গ্রীষ্মাবকাশে ও পূজার ছুটিতে। বড়দিনের ছুটিতে দাদার কর্ম্মস্থান কানপুরে যাইয়া থাকি। এবার প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত যাওয়া হয় নাই। বড়-দিনের ছুটিতে কলিকাতায় থাকিয়াই 'টেষ্ট্' পরীক্ষার জন্য

প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। বাটীতে আসিয়া প্রায় পক্ষাধিক কাটাইয়াছি, এমন সময়ে একদিন দাদার একখানি পত্র পাইলাম। পত্রে লেখা আছে ঃ—

"অতুল, তুমি এখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বাটীতে রহিয়াছ। তুমি এখানে অনেক দিন আস নাই। তোমার বউদিদি তোমাকে একবার দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছে, তুমি সত্বর একবার আসিও। পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয় ও মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন? তাঁহাদিগকে বলিও যে, আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের শ্রীচরণ দর্শনে যাইব, তাঁহাদিগকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবে। ইতি—

কানপুর	তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দাদা
১৮ই চৈত্র।	শ্রীবিজয়চন্দ্র।

পুঃ। তুমি কোন তারিখে এখানে পৌছিবে পত্র পাঠ লিখিবে। ইতি—"

দাদার পত্রখানি পাইয়া কানপুর যাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পত্রের যথাযথ উত্তর

লিখিয়া দিয়া পিতা মাতার অনুমত্যানুসারে ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া কানপুর যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে আমি কানপুর পৌছিলাম। দাদা, বৌদিদি ও দাদার ছেলে মেয়েরা আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। কানপুরের অনেকেই আমাকে চিনিতেন। আমি একে একে সকলেরই সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। দাদার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা; তাহারাত' 'কাকা, কাকা' করিয়া অস্থির। কেহও এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার কাছ ছাড়া হইত না। এমন কি, একদিন বৌদিদি আমাকে বলিলেন যে, "ঠাকুরপো! তোমাকে পাইয়া অমল বিমলের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে।" বস্তুতঃ, তাহাদের আর আহার বিহারে ইচ্ছা ছিল না। এইরূপে দাদার যত্ন, বৌদিদির স্নেহ ও বালক বালিকাদের ভালবাসা লইয়া প্রায় মাসাধিক কাল অতিবাহিত করিলাম।

মানুষ কখনও একস্থানে নিষ্কর্ম্মা হইয়া অধিক দিন থাকিতে পারে না। আমারও অবশেষে সেই-দশা ঘটিল। আমার, আর জড়ভরতের ন্যায় বসিয়া থাকা ভাল লাগিল না।

এক দিন সন্ধ্যাকালে দাদা আফিস হইতে আসিয়া

দৈনিক সান্ধ্য ক্রিয়া সমাপনান্তে যখন বৈঠকখানায় শয়ন পূর্ব্বক ইংরাজী সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিলেন, তথন আমি ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং কহিলেন, "কই অতুল! আজ ভ্রমণ করিতে যাও নাই?" আমি কহিলাম, "আজ্ঞে, গিয়াছিলাম, আজ একটু সকাল সকাল চলিয়া আসিয়াছি।" দাদা কহিলেন, "তবে ব'স।" আমি বসিলাম। তৎপরে একথা, ও কথার পর, আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দাদা, আমার একবার কানপুরের বহির্ভাগস্থ স্থান সমূহ দর্শন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি যদি আজ্ঞা করেন তাহা হইলে আগামী কল্যই যাত্রা করি। দাদা কহিলেন, "তা' আমায় এতদিন বল নাই কেন? কল্য আর যাওয়া হইবে না। আমি কল্য যাইয়া তোমার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া একজন লোক সঙ্গে দিব, সে তোমাকে প্রত্যেক স্থান দর্শন করাইয়া আনিবে।"

পর দিবস দাদা সমস্ত ঠিক করিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলাম। আসিবার সময় দাদার ছেলে মেয়েরা অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহাদিগকে 'শীঘ্রই আসিব' এই স্তোক বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া রাখিয়া আসিলাম। গাড়ীতে কেবল তাহাদেরই কথা ভাবিতে লাগিলাম, এবং তাহাদেরই মুখ-চ্ছবি স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল। এই অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদিগের উপর আমার এত মায়া হইয়াছিল যে, অমল বিমলের এক মুহূর্ত্ত অদর্শনও আমার পক্ষে অসহ্য বোধ হইত। যাহা হউক শীঘ্রই ফিরিব স্থির করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিলাম।

যে স্থান আমার অবস্থানের জন্য নিরূপিত হইয়াছিল, সে স্থান কানপুরের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ও চারি ক্রোশ ব্যবধান। আমাদের গাড়ী সেই স্থানে যাইয়া উপ-স্থিত হইল। স্থানটী অতীব সুন্দর; দেখিলে নন্দন-কানন বলিয়া ভ্রম হয়। চারি দিকে প্রান্তর, মধ্যস্থলে একটী অনতিদীর্ঘ বাগান। বাগানের মধ্যে একটি বাঙ্গালা; সেই বাঙ্গালাই আমার থাকিবার জন্য নিরূপিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সম্মুখে একটি স্বল্প বিস্তৃত পুষ্করিণী ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী পুষ্পকানন। এই স্থানটী অতি রমণীয় এবং আমার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছিল। পুষ্করিণীর তীরে দাদার একজন বন্ধু বসিয়াছিলেন। আমি যাইতেই তিনি

কহিলেন, "অতুল বাবু আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছি। আমাকে আপনি চেনেন না। আমার নাম অমর, বিজয় বাবু আমার পরম হিতৈষী বন্ধু।"

আমি কহিলাম, "আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, আপনার ন্যায় মহৎব্যক্তির সহিত আলাপ হইল। এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে এই বাঙ্গালায় কে বাস করেন?" উত্তরে জানিলাম যে, এই বাঙ্গালা অমর বাবুরই এবং তিনি এইখানেই বাস করেন। অমর বাবু ধীর, শান্ত ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাহার সহিত আলাপ করিয়া আমি বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে চতুর্দ্দিকস্থ স্থান দর্শন করাইয়া আনিতেন। মধ্যাহ্নে তিনি কানপুরে তাঁহার কর্ম্মস্থানে গমন করিতেন। সে সময় আমি একা থাকিতাম। বাঙ্গালার মধ্যে অমর বাবুর একটি পাঠাগার ছিল। পাঠাগারে অনেক পুস্তক। আমি সেই সময়টা কখনও পুস্তক পাঠে, কখনও বা কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া সময় ক্ষেপণ করিতাম। কবিতা লেখা রোগটা ছেলেবেলা হইতেই আমার ঘাড়ে চাপিয়াছিল। দাদা মধ্যে মধ্যে বলিতেন যে, অতুলকে কবিতা-রোগের একটা

ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। এই বাঙ্গালায় আসিয়া কবিতা-লেখা-রোগটা একটু বেশী পরিমাণে চাপিয়াছিল; তদ্ভিন্ন দুই একটী উপসর্গও দেখা দিয়াছিল।

অমর বাবুর নিকটে অমল বিমলের সংবাদ প্রত্যহই পাইতাম। তিনি বলিলেন যে, তাহারা আর এখন বেশী কাঁদে না; সুতরাং সুস্থ হইলাম। একদিন মধ্যাহ্নে অমর বাবু চলিয়া গিয়াছেন। আমি একা বাঙ্গালায় তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া আছি। মনটা বড অস্থির হইয়াছে; পুস্তক পাঠ করিতে বসিলাম, কিন্তু এক ছত্রেরও অর্থবোধ করিতে পারিলাম না; পুস্তকখানি রাখিয়া একটু কবিতা লিখিতে বসিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় ছন্দ মিলাইতে পারিলাম না; কাগজটা ফেলিয়া দিলাম। তৎপরে অমর বাবুর 'Visit Book'এ লিখিলাম:—

"অমরবাবু, আজ কিছুতেই ভাল লাগিল না। একটু ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। আপনি এখানে নাই, সুতরাং একাই চলিলাম। আমি এখানকার সকল স্থানই বেশ চিনিয়াছি, একা যাইতে কোনরূপ কষ্ট হইবে না। আজ যদি না আসিতে পারি তাহা হইলে আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমি কোন স্থানে আশ্রয় সংগ্রহ

করিয়া লইব; আগামী কল্যই প্রত্যাগমন করিব। ইতি—

আপনার স্নেহের

শ্রীঅতুল।”

লেখা সমাপ্ত করিয়া উপযুক্ত বেশ বিন্যাসে সজ্জিত হইয়া ভ্রমণেচ্ছায় বহির্গত হইলাম। তখন বেলা দেড়টা। জ্যৈষ্ঠ মাস—দারুণ রৌদ্র। কিন্তু রৌদ্রের দিকে আমার দৃষ্টি নাই। ছেলেবেলা হইতে আমি রৌদ্র বৃষ্টিকে গ্রাহ্য করি না। আমি পূর্ব্ব দিকে চলিতে লাগিলাম। বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বেলা পাঁচটার সময় একটি প্রকাণ্ড বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীটীকে একটি ক্ষুদ্র রাজপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি ভাবিলাম যে এখন বেলা পাঁচটা; এক ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিবেন। অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে; এখন ফিরিয়া যাইতে হইলে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে। অদ্য এই স্থানেই রাত্রি যাপন করি; ভাবিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

বাটীর প্রাঙ্গণে একজন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া কোন বস্তু

নিরীক্ষণ করিতেছিল। বৃদ্ধের পক্ক কেশ ও পক্ক শ্মশ্রু বিলম্বিত; দেখিলে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। আমি তাহাকে কহিলাম, "মহাশয় নমস্কার! আমি এখানে অদ্য রজনী যাপনের জন্য একটু স্থান পাইতে পারি কি?" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "মহাশয় আমি বাটীর কর্ত্তা নই। ভিতরে পাকশালায় আমার পিতা আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" আমি ভিতরে পাকশালার উদ্দেশে গমন করিয়া দেখিলাম যে একজন অতিবৃদ্ধ ভোজন ব্যাপারে নিযুক্ত। আমি তাহাকে কহিলাম, "মহাশয় নমস্কার! আমি এখানে অদ্য রজনী যাপনের জন্য একটু স্থান পাইতে পারি কি? উত্তরে বৃদ্ধ কহিল, "মহাশয় আমি বাটীর কর্ত্তা নহি, পার্শ্বের একটি বড় ঘরে টুলের উপর আমার পিতা বসিয়া আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" আমি বৃদ্ধ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, যে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধদ্বয় অপেক্ষাও একজন বৃদ্ধ টুলের উপর বসিয়া একখানি সুবৃহৎ পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কহিলাম, "মহাশয় নমস্কার! আমি এখানে অদ্য রজনী যাপনের জন্য একটু স্থান পাইতে পারি কি?" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "মহাশয়, আমি

বাটীর কর্ত্তা নহি। দ্বিতলে একটি গৃহে আমার পিতা আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন.।" আমি বাল্যকাল হইতেই 'ভয়' কাহাকে বলে জানিনা, কিন্তু মনে একটু শঙ্কা উপস্থিত হইল ; তথাপি সাহসে ভর করিয়া দ্বিতলের গৃহে যাইয়া দেখিলাম যে পূর্ব্বোক্ত তিন জনের অপেক্ষাও একজন বৃদ্ধ তাম্বুল চর্চ্চায় নিযুক্ত। আমি তাহার তাম্বুল চর্চ্চায় বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় নমস্কার! আমি এখানে অদ্য রজনী যাপনের জন্য একটু স্থান পাইতে পারি কি ?" উত্তরে বৃদ্ধ কহিল, "মহাশয়! আমি বাটীর কর্ত্তা নহি। ত্রিতল গৃহে আমার পিতা আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ত্রিতলের সোপান অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, একজন, সকলের অপেক্ষাও অতিবৃদ্ধ জানুর উপর বদনমণ্ডল ন্যস্ত রাখিয়া উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে কহিলাম, "মহাশয় নমস্কার! এখানে অদ্য রজনী যাপনের জন্য একটু স্থান পাইতে পারি কি ?" বৃদ্ধ কহিল, "মহাশয়, আমি বাটীর কর্ত্তা নহি। পার্শ্বের গৃহে একটি দর্পণের মধ্যে আমার পিতা আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" আমি ভয়-

বিজড়িত চিত্তে অত্যাশ্চর্য্য হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি প্রকাণ্ড দর্পণ দৃষ্টি করিলাম। আমি সেই দর্পণখানির সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র একটি অতি বৃদ্ধের মূর্ত্তি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল! আমি তাহাকে ভয়বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় নমস্কার! এখানে অদ্য রজনী যাপনের জন্য একটু স্থান পাইতে পারি কি?" প্রতিবিম্ব প্রতিনমস্কার করিয়া কহিল, "হা মহাশয়, স্থান পাইবেন। আপনি ইচ্ছা করিলে থাকিতে পারেন।" আমার অত্যন্ত ভয় হইল; সুতরাং একটি মিথ্যা কথা কহিতে বাধ্য হইয়া কহিলাম, "তবে মহাশয়, আমি বাহির হইতে আমার সঙ্গীকে ডাকিয়া আনি।" প্রতিবিম্ব একটু ঈষদ্ হাস্য করিল। আমি স্বেদসিক্ত কলেবরে দ্রুতপদে নিম্নে অবতরণ করিয়াই রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। তখনও একটু বেলা আছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রান্তর দিয়া দৌড়াইতে লাগিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, শুক্লাষ্টমীর রাত্রি,—জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দুই একটি পক্ষী উষাভ্রমে মধুর গীত গাহিতেছিল। দুই একটি পেচক দিগন্ত কম্পিত করিয়া মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছিল। অদূরে একটি কৃষক সুমিষ্ট স্বরে "বঁধু ব্রজে যাওয়া

আর হ'ল না" গীত গাহিতেছিল। আমি ক্রমান্বয়ে চলিয়া রাত্রি এগারটার সময় বাঙ্গালায় আসিয়া পৌছিলাম। অমরবাবু অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু আমি একটিরও উত্তর দিতে না পারিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলাম; সে রাত্রে আমার অত্যন্ত জ্বর হইল। জ্বরে প্রলাপ বকিতে লাগিলাম; প্রলাপের মধ্যে "মহাশয়, আমি বাটীর কর্ত্তা নই, আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করুন" এই কথা গুলিই মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত হইতে লাগিল। অবশ্য আমার তখন জ্ঞান ছিল না। দাদা ও অমর বাবুর মুখে এখন শুনিতে পাই। আমার এবম্প্রকার জ্বর দেখিয়া অমর বাবু অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং দাদাকে অনতিবিলম্বে সংবাদ দিলেন। দাদা কালবিলম্ব না করিয়া বৌদিদি ও বালক-বালিকাগণ সহ উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম। পীড়া উপশমিত হইলে দাদা ও অমর বাবু "আমি বাটীর কর্ত্তা নহি" সম্বন্ধে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি তাঁহাদের আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করিলাম। তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বীত হইয়া কহিলেন,"উহা 'ভৌতিক'।" অধিকন্তু আমাকে কখনও একাকী কোনস্থানে যাইতে নিষেধ

করিলেন। আমি সম্যক্ আরোগ্যলাভ করিয়া দাদা ও অমর বাবুর সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটি মহারণ্য ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। ইহার পর হইতে আর আমি একাকী কোনস্থানে গমন করি না। সে দৃশ্য মনে হইলে এখনও আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

(জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮।)

বিবাহ রহস্য

বা

"মন্দ নয়!"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"দেখ, নবীনকিশোর, প্রত্যহই আমার নিকট তোমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইতেছে কেন? তোমাদের মনোমালিন্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? তোমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইতেছে! প্রত্যহ এরূপ কলহ করিয়া নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠার মারিতেছ কেন? কলহ করিলে মনের অবস্থা স্বতঃই খারাপ হইয়া থাকে, তাহাতে পড়াশুনার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছ! এখন কি অল্পবয়স্ক, অপরিণতবুদ্ধি, নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগের

ন্যায় কলহ করা ভাল দেখায়? কলহ করিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিও না। তোমাদের এই শিক্ষার প্রকৃত সময়; এখন যাহা শিক্ষা করিবে সেই শিক্ষাই হৃদয়ে চিরদিন বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। এখন যদি দিবারাত্রি এবম্প্রকার কলহে কালক্ষেপণ কর তাহা হইলে কলহেতেই তোমরা অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। তোমাদের বয়স হইয়াছে, নিজেদের ভালমন্দ নিজেরা বুঝিতে শিখিয়াছ; তোমাদের অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।"

কলিকাতার কোন একটি খ্যাতনামা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় উল্লিখিত উপদেশ কয়েকটি প্রদান করিলে একটি সৌম্যমূর্ত্তি ও শান্তপ্রকৃতি বালক বিনীতভাবে কহিল, "মহাশয়! আমি যোগীনের সহিত সদ্ভাব রাখিতে সদাই প্রস্তুত, কিন্তু যোগীন কিছুতেই সম্মত নয়। কি দোষে যে যোগীন আমার উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছে তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যোগীনের সহিত বাক্যালাপ করিতে যাইলে, যোগীন বিরক্তভাবে সে স্থান হইতে প্রস্থিত হয়; আমি যোগীনকে ডাকিলে যোগীন আমার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অন্যদিক দিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে আমি বড় দুঃখিত।"

মা। "কেন গো যোগীন, তুমি নবীন কিশোরের প্রতি ঈদৃশ আচরণ করিতেছ কেন?"

"মাষ্টার মহাশয়! নবীন আমাকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করে।"

অপর দিক হইতে শান্ত ও সংস্বভাবযুক্ত অপর একটি বালক এই কয়েকটি কথা উচ্চারিত করিল। ইহা শুনিয়া নবীন কহিল—

"কই! আমি ত' তোমাকে কখনও বিরক্ত করি নাই। তুমিই ত' কয়েক দিবস হইতে আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছ!"

ইহাদের বাদানুবাদে বাধা দিয়া শিক্ষক মহাশয় কহিলেন——

"না, তোমাদের এরূপ কলহ আমাদের আর ভাল লাগে না। ইহাতে আমাদের অমূল্য সময় নষ্ট হইয়া যাই-তেছে। তোমাদের একটা কথা বলিয়া দিই, যে, হয় তোমরা নিজেদের মধ্যে নিজেরা মীমাংসা করিয়া ফেল, না হয়, আমাদের কাছে রাত্রি দিন নালিশ করিও না। তোমাদের আর কত বুঝাইব।—তোমাদের আজ Charles II পড়া আছে না?—বলিয়া শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপনা

কার্য্যে বা স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া পাঠ-প্রস্তুত-বিহীন ছাত্রদিগের আতঙ্ক উপস্থিত করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষক মহাশয় ততক্ষণ পাঠ জিজ্ঞাসা কার্য্য আরম্ভ করুন, আমরা ইত্যবসরে কথাপ্রসঙ্গে যোগেন ও নবীনকিশোর সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া ফেলি।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও নবীনকিশোর দত্ত উভয়েই কলিকাতা নিবাসী ও সঙ্গতিপন্ন। যোগেনের পিতা মাতা উভয়েই বর্ত্তমান। যোগেনের পিতা কালাচাঁদ ঘোষ পূর্ব্বে রেলির বাটীর সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে ও প্রতিভা বলে অতি অল্পকালের মধ্যে তত্রস্থ বড় সাহেব Mr. Manleyর প্রিয় পাত্র হইয়া ক্রমে মুচ্ছুদ্দি পদ প্রাপ্ত হয়েন। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া পেন্সেন প্রাপ্ত হইয়া বাটী বসিয়া আছেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় দুইখানি বাটী ও কিছু জমিদারীও করিয়াছেন। কালাচাঁদ বাবুর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ নগেন্দ্র ও কনিষ্ঠ যোগেন্দ্র। নগেন্দ্রনাথ

'প্রেসিডেন্সী'তে বি. এ. পড়িতেছেন ও যোগেন্দ্রনাথই আমাদের পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্র।

নবীনকিশোর পিতৃহীন। ইহারা তিন সহোদর। জ্যেষ্ঠ হরিকিশোর দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি; মাসে সাত আট শত টাকা উপার্জ্জন করেন। তাহাতেই তাঁহাদের সংসার বেশ সচ্ছল ভাবে চলে। মধ্যম নবীন-কিশোর প্রথম শ্রেণীতে ও কনিষ্ঠ শিশিরকুমার ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। হরিবাবু কলিকাতা বীডনষ্ট্রীটে দর্জ্জীপাড়ার মোড়ে সম্প্রতি একখানি ত্রিতল অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছেন।

নবীনকিশোর ও যোগেন্দ্রনাথ শৈশবকাল হইতেই সমপাঠী। উভয়েই পড়াশুনায় অদ্বিতীয় ও ক্লাসের প্রথম দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী এবং শিক্ষক মহাশয়দিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র। তাহারা পরস্পরে অকৃত্রিম মিত্রতাপাশে বদ্ধ। কিন্তু আজ দিন চারেক হইল তাহাদের পরস্পরের বিরোধ ভাব ঘটিয়াছে। একটি সামান্য বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছে। উভয়েই সে জন্য অতিশয় দুঃখিত। তাহারা উভয়েই মনে করে অগ্র কথা কহিবে, কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না।

জলস্রোত ও সময় কাহারও হাতধরা থাকে না। দিবা

নাই, রাত্রি নাই অবিরত স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছে। স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে আলস্য বা দীর্ঘ-সূত্রতা না করিয়া আপনমনে অগ্রসর হইতেছে; ইহাতে তুমি দুঃখিত হও আর না হও সে বিষয়ে দৃক্‌পাত করিবে না। ক্রমে দুই তিন মাস অতীত হইল। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের প্রতি বিতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজকাল বিবাহ বাজার যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহা সকলেই সম্যকরূপ অবগত আছেন। সে বিষয়ে, আমাকে খানিকটা কালী ও কাগজের অপব্যয় করিয়া বিশেষরূপে জানাইয়া দিবার আবশ্যক করে না। যে বাটীতে দুইটি কি একটি ছেলে আছে,সে বাটীতে 'ঘটক-ঘটকী'র যাতায়াতের কিরূপ ধুম পড়িয়া যায় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। কোন স্থানে এক ফোঁটা গুড় বা চিনি পড়িলে সেখানে অলক্ষিতে মুহূর্ত্তমধ্যে যেমন অসংখ্য পিপীলিকার সমাগম দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কোন বাটীতে একটি ছেলে বা

মেয়ে থাকিলে সেখানে অসংখ্য 'ঘটক-ঘটকী' মহাশয় বা মহাশয়াদের শুভাগমন হইয়া থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারে আমাদের কালাচাঁদ বাবুর বাটীটির প্রতিও অচিরাৎ 'ঘটক-ঘটকী'দের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। কালাচাঁদ বাবু ইতি পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠ পুত্রটির পরিণয় কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটির জন্য উক্ত অবতারগণ কালাচাঁদ বাবুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি ক্রমান্বয়ে বলিতে লাগিলেন, "ছেলে যতদিন পর্য্যন্ত না প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ দিব না।" কিন্তু বিধাতা, ঘটকদিগকে যে বাক্যৌষধিরূপ অস্ত্র দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, সে অস্ত্রের সম্মুখে একদণ্ড তিষ্ঠান কাহার সাধ্য! ক্রমে অবতারদিগের বাক্যস্রোতে, কালাচাঁদ বাবুর প্রতিজ্ঞা, সামান্য তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়া গেল। তিনি দর হাঁকিলেন "পাঁচহাজার টাকা দক্ষিণার কমে কাহারও দুহিতাকে পুত্রবধূরূপে কখনই গ্রহণ করিব না।" কিন্তু কিমাশ্চর্য্য কিমদ্ভুতম্! ইহাতেও নিস্তার নাই। পটলডাঙ্গার মতি ঘটক, কালাচাঁদ বাবুকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিল, "অমুক স্থানের, অমুক বাবুর কন্যা আছে। মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী ও গুণে

সাক্ষাৎ সরস্বতী! দেবে থোবেও মন্দনয়। ব'লে ক'য়ে চারি হাজার টাকা বাহির করিব। কিন্তু আমাকে এক শত টাকা নগদ ও একটা ঘড়া, বিদায় করিতে হইবে।" কালাচাঁদ বাবু কহিলেন "'তথাস্তু' কিন্তু সাড়ে চারি হাজার টাকার এক পয়সা কমে কিছুতেই হইতেছে না।"

কন্যাপক্ষ তাহাতেই রাজী; কি করেন! ও পাপ শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইলেই তাঁহারা বাচেন।

যথা সময়ে পাত্রপাত্রী আশীর্ব্বাদ সম্পন্ন হইয়া গেল। যোগেন ক্লাসের সকল বন্ধুকে Invitation Card পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিল; কিন্তু নবীনকিশোরকে করিল না। এ দিকে নবীনকিশোরের ভ্রাতুষ্কন্যার বিবাহোপলক্ষে সেও কয়েক দিন হইতে স্কুল আসা বন্ধ করিয়াছে। ২৯শে শ্রাবণ বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গিয়াছে। এই দিনটিই এ মাসের মধ্যে প্রশস্ত দিন। তৎপরে ভাদ্র মাস হইতে তিন চারি মাস পর্য্যায়ক্রমে বিবাহের দিন নাই; সে কারণ এই দিনে অনেক বাটীতেই বিবাহের ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

শুভদিনে শুভক্ষণে আমাদের যোগেন বর-সাজে সজ্জিত হইয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে বাস্থ ও

আলোকমালায় চতুর্দ্দিকস্থ রাজপথ প্রতিধ্বনিত ও আলোকিত করিয়া বিবাহ আসরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথে ছোট ছোট বালকবালিকাবৃন্দ ও নরনারীসমূহ "বর আসিতেছে, বর আসিতেছে" শব্দে কলিকাতার সঙ্কীর্ণ বা নাতিবৃহৎ গৃহ সমূহ বিদীর্ণ করতঃ কেহ বা অলিন্দায়, কেহ বা গবাক্ষে, কেহ বা পথে আশ্রয় লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবীনকিশোরদের বাটীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ "তামাক দে," কেহ "পাখা দে," কেহ বা "ফুলের-মালাগুলো কোথায় গেলরে" প্রভৃতি শব্দে বিবাহবাটী জমকাইতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত হইল বর আসরে আসিয়াছে; এখনও ইংরাজী বাদ্য ও রসনচৌকীর মর্ম্মভেদী গম্ভীর আওয়াজ শান্তিলাভ করিতে পারে নাই।

এরূপ সময়ে নবীনকিশোর অন্দর-মহলের একটি প্রকোষ্ঠে 'নান্দীমুখ' কার্য্যে নিযুক্ত। পুরোহিত-ঠাকুর মন্ত্র-পাঠ করিতেছেন, নবীনকিশোর তাঁহার উচ্চারিত মন্ত্র

সমূহ পুনরুচ্চারিত করিয়া যথা-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছেন। নবীনকিশোরের বর দেখা উল্টিয়া গিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর হরি বাবুর অত্যধিক শ্রান্তি বশতঃ শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ বোধ হওয়ায় নবীনকিশোরকেই সম্প্রদান কার্য্য করিতে হইবে।

এই সময়ে হরি বাবু আসিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু সত্বর সত্বর কার্য্য সারিয়া লউন, আর সময় অধিক নাই। স্ত্রী-আচারের সময় হইয়াছে। নান্দীমুখ করিতে বড় বিলম্ব হইয়াছে।" পুরোহিত ঠাকুর তাঁহার অর্দ্ধহস্ত পরিমিত শিখা দুলাইয়া কহিলেন, "নান্দীমুখের আয়োজন করিতেই বিলম্ব হইয়া গেল, আমার আর দোষ কি?"

এদিকে যোগেন্দ্র নাথকে আসর হইতে উঠাইয়া লইয়া যথারীতি স্ত্রী-আচারাদি সমাপনান্তে যথাসময়ে সম্প্রদানগৃহে আনয়ন করা হইল। সম্প্রদানগৃহ লোকে লোকারণ্য। সকলেই নববধূর মুখ দর্শনে উৎসুক। প্রকোষ্ঠটি ক্ষুদ্র। সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ। একখানি কুশাসনে যোগেন্দ্রনাথ ও বামপার্শ্বে আলিপনা নির্লিপ্ত কাষ্ঠাসনে পট্টবস্ত্রে অবগুণ্ঠিতা বালিকা

উপবেশন করিল। সম্মুখে কন্যার খুল্লতাত সম্প্রদান করিবার মানসে একখানি কম্বলমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট ও পার্শ্বে পুরোহিত ঠাকুর। কন্যার খুল্লতাতের অদৃষ্টে এতৎকালাবধি জামাতা-সন্দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। এক্ষণে তিনি সে সুযোগ ছাড়িতে না পারিয়া জামাতা বাবাজিউর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। যোগেন্দ্রনাথও তাহার দিকে চাহিল। চারিচক্ষু মিলিত হইবামাত্র উভয়েই মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, **"মন্দনয়!"** বলা বাহুল্য যে কন্যার খুল্লতাত আর কেহই নহেন, আমাদের 'নবীনকিশোর'। তিনি প্রহৃষ্টমনে স্বীয় ভ্রাতৃষ্কন্যাকে বন্ধুবরের হস্তে সম্প্রদান করিয়া কহিলেন, "ভাই! যদিও তোমার সহিত আমার সম্পর্ক একটু গুরুতর হইল, তথাপি আমি পূর্ব্বের সম্পর্কই মনে করিব। তোমার সহিত আমার যে একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, সেই মনোমালিন্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার ভ্রাতৃষ্কন্যাকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি নবদম্পতী পরমসুখে কালাতিপাত কর।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস যথাসময়ে যোগেন্দ্রনাথ নববধূ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। পিতামাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে ও অত্র প্রদেশস্থ প্রচলিত মেয়েলি-প্রথানুযায়ী কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপনান্তে একটু সুস্থির হইয়া নিজের পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া নবীনকিশোরকে একখানি পত্র লিখিল। পত্রখানি গোপনীয় (private) ; সুতরাং পত্রখানির সম্বন্ধে আমাদের আর হাত নাই। তবে পাঠক মহাশয়দের কৌতূহল নিবারণার্থ কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পত্রখানির সারাংশ এই :—

"ভাই নবীনকিশোর, তোমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া আমি এতদূর লজ্জিত হইয়াছি যে তোমার নিকট মুখ দেখাইতে আর ইচ্ছা করিতেছে না। তুমি আমার বাল্যপাঠী, তোমার সহিত আজন্ম মিত্রতাপাশে বদ্ধ ছিলাম ; কিন্তু কতকগুলি অসৎ বালকের কুপরামর্শে ও কৌশলে তোমার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে নিজের অপরিণামদর্শিতার জন্য নিজেই দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। তোমার নিকট আজন্ম স্নেহ-ঋণে ঋণী

রহিলাম। আমি এতদিন তোমার সহিত পুনরায় সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইব মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু করিতে পারি নাই; কি এক লজ্জা আসিয়া বাধা দিত। আশা করি, নিজগুণে অপরাধ বিস্মৃত হইয়া ক্ষমা করিবে। আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানিবে। আর অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। ইতি

তোমারই অভিন্ন-হৃদয়

যোগেন।

পত্রশেষে বড় বড় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইল—

"Forgive and forget."

পত্র পাইয়া নবীনকিশোর যৎপরোনাস্তি সুখী হইল ও পরস্পরে পুনরায় সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হইল।

(২রা ভাদ্র রবিবার ১৩০৮।)

সোনার সংসার।

(১)

বাঙ্গালীর ঘরে ধনী সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে সচরাচর অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, চারু-চন্দ্রেরও অবস্থা অবশেষে সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। চারুচন্দ্র পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃমাতৃহীন হয়। সংসারে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র ও বৌদিদি প্রভাবতী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। সোদর চারুচন্দ্রকে, শরৎচন্দ্র ও প্রভাবতী প্রাণপণে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বদ্ধপরিকর হইলেন যাহাতে শিশু, পিতা-মাতার অভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে। তাঁহাদের যত্নে চারুচন্দ্র দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অসংখ্য দাস দাসী থাকিলেও চারুকে নিজহস্তে সেবাশুশ্রূষা না করিলে শরতের ও প্রভাবতীর তৃপ্তি হইত না।

(২)

জীবনকৃষ্ণ বাবুর নিবাস শ্রীরামপুরে। ইনি একজন মস্ত জমিদার। ইঁহার যেমন অর্থের অভাব নাই, তেমনই দানেরও ইয়ত্তা নাই। শুনা যায়, সেবার নাকি জীবন বাবু গুজরাট যুদ্ধের ব্যয়ের নিমিত্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট্কে সাত-কোটী তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া ইংরাজী ভাষার সমুদয় বর্ণমালাগুলিকে খেতাবস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মায়ের শ্রাদ্ধ, ছেলের বিয়ে, এ সবে ত দানধ্যান আছেই। ইঁহার দুইটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ শরৎচন্দ্র ও কনিষ্ঠ চারুচন্দ্র। জীবন বাবু শরৎচন্দ্রের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহোৎসব সন্দর্শন তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটিল না। চারুচন্দ্র যখন পঞ্চম বর্ষের, তখন তাহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্র ও পুত্রবধূ প্রভাবতীর করে সমর্পণ করিয়া সস্ত্রীক এই জরাব্যাধিপূর্ণ পৃথিবী হইতে বিদায় লয়েন।

শরৎচন্দ্র, কনিষ্ঠের বিদ্যাশিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দুই তিনটি 'প্রাইভেট্ টিউটর' নিযুক্ত হইল; তাঁহারা নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া হাজিরা সহি করিয়া প্রতি মাসে মুদ্রা গণিতে লাগিলেন, কিন্তু চারুচন্দ্রের কিছুই হইল না। তাহার বিদ্যাশিক্ষায় আদপে

মন নাই। শরৎচন্দ্র বুদ্ধিমান ও সর্ব্বপারদর্শী। তিনি বিধিমতে চারুচন্দ্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সকল উপদেশ ভস্মে ঘৃত হইল। চারুচন্দ্রের পাঠাভ্যাসে কিছুতেই মন রহিল না। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার নানা দোষ জন্মিতে লাগিল। বড় লোকের ছেলে, সঙ্গীর অভাব হইল না, চারুচন্দ্রের আশে পাশে বিস্তর কুসঙ্গী জুটিল। তাহাদের সংসর্গে মিশ্রিত হইয়া চারু মদ্য-পানে আসক্ত হইল। শরৎচন্দ্র বিপদ গণিলেন। তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া সহোদরকে সংসারী করিবার অভিপ্রায়ে চারুর বিবাহ দিলেন।

(৩)

কুসুমকুমারী বড় বুদ্ধিমতী। তাহার যেমন রূপ, তেমনই গুণ। দশমবর্ষীয়া বালিকা কুসুম, প্রথম পিতামাতার কাছ ছাড়া হইয়া, শৈশব কালের চিরসঙ্গী সেই আবাস গৃহ, পুতুলের বাক্স প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুর বাটী আসিয়া, আপনার সমস্ত চিনিয়া লইল। সে প্রভাবতীকে ভক্তি ও মান্যে মাতৃতুল্য, স্নেহ ও আদরে সোদরার ন্যায় জ্ঞান করিত। প্রভাবতীর নিকট শিষ্যার ন্যায় থাকিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করিত। প্রভা-

বতীও তাহাকে সোদরাধিকের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। উভয়ের বড় ভাব ও সম্প্রীতি। কুসুম প্রতিদিন অপরাহ্নে "রামায়ণ," "মহাভারত," "অন্নদামঙ্গল," "মাইকেল মধু-স্দন দত্তের গ্রন্থাবলী," "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতি কত শত পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইত, আর প্রভাবতী অনিমেষ-নয়নে, কুসুমের সৌন্দর্য্যমাখা সুন্দর মুখখানি ও পাঠজনিত তাহার স্ফুরিতাধরপল্লব দর্শন করিতেন। যতই দেখিতেন, ততই তাঁহার অন্তঃকরণ পুলকে পুলকিত হইত। তিনি নিজেও লেখাপড়া জানেন, কিন্তু কুসুমকুমারী পাঠ না করিলে তাঁহার ভাল লাগিত না।

কুসুম শ্বশুর বাটী আসিয়া স্বামীকে বেশ চিনিল, চারুও কুসুমকে চিনিল। কুসুম দেখিল তাহার স্বামী সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ, কিন্তু সংসর্গদোষে সে দেবত্ব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আর চারু দেখিল, কুসুম দেবী—তাহার ক্ষুদ্র বালিকা-হৃদয়টুকুতে যে অপার্থিব গুণ নিহিত আছে, তাহা মানবীতে সম্ভবে না, সে গুণ স্বর্গীয়। কুসুম স্বামীকে সৎপথে আনয়নার্থ বিস্তর উপদেশ দিত ও অনুরোধ, অনুযোগ করিত। তাহার উপদেশে চারুর কুপথে ঘৃণা হইল। সে সৎপথে থাকিতে স্বীকৃত হইল।

কিন্তু 'মানুষ গড়ে আর বিধি ভাঙ্গেন'। চারুকে এবংবিধ হইতে দেখিয়া তাহার সঙ্গীরা তাহাকে লইয়া কৌতুক করে। কেহ বলে, "চারু দিন দিন স্ত্রৈণ হইতেছে," কেহ বলে, "চারু সন্ন্যাসী হইবে," কেহ বলে, "চারু আমাদের অসাক্ষাতে মদ ব্যবহার করে, পাছে আমাদিগকে অংশ দিতে হয়।" তাহাদের এইরূপ কৌতুকে চারু অতিশয় লজ্জিত হইত। এই লজ্জাই তাহাকে বিচলিত করিল। চারুর অধঃপতন আরম্ভ হইল।

(৪)

এমনি করিয়া কয়েকটি বৎসর অতীত হইয়া গেল। চারুর একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে; পুত্রটির বয়স চারি বৎসর। কুসুম পুত্রের নাম রাখিয়াছে প্রফুল্ল। কিন্তু কুসুমের মনে কিছুমাত্র সুখ নাই, কিছুমাত্র শান্তি নাই। সে আজ রাজার ঘরণী হইয়াও ভিখারিণী, সে আজ পতি থাকিতেও বিধবা। যে পতি আর্য্যরমণীর ইহকালের ও পরকালের একমাত্র গতি, যে পতি হিন্দুরমণীর একমাত্র ইষ্টদেবতা, যে পতি ভিন্ন হিন্দুমহিলা ইহসংসারে কিছুই জানে না, যে পতির আহার বিহারে আর্য্যরমণীর সুখশান্তি, যে পতির সুখে আর্য্যরমণীর সুখ, যে পতির দুঃখে আর্য্যরমণীর

দুঃখ—সেই পতিই, সেই কুসুমের পতি চারুচন্দ্রই আজ ঘোরতর সুরাপায়ী। সুরাই তাহার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়াছে, সুরাই তাহার মনুষ্যত্ব অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কুসুমের স্বামীর প্রতি ভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হইয়াছে? তাই বলিয়া কি কুসুম স্বামীকে অস্পর্শনীয় মনে করিতেছে? তাই বলিয়া কি কুসুম স্বামীকে নিন্দা করিতেছে? না, তাহা নয়। সে কেবল নিজ অদৃষ্টকেই নিন্দা করিতেছে, নিজেকেই অভাগিনী মনে করিতেছে। ধন্য হিন্দুরমণী, ধন্য আর্য্যসুতা; স্বামী কি বস্তু তাহা তোমরাই বুঝিয়াছ, স্বামী কি বস্তু তাহা তোমরাই চিনিয়াছ।

শরৎচন্দ্র, প্রভাবতী ও কুসুমকুমারী, চারুকে বিস্তর বুঝাইলেন, মদ্য ত্যাগ করিতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন নির্জ্জনে শরৎ, চারুকে ডাকিয়া সস্নেহে কহিলেন, "ভাই! এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, এখনও নিজের প্রতি তাকাইয়া দেখ, এখনও তোমার অবলা, সরলা, স্নেহময়ী পত্নী ও নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, অজ্ঞান শিশুর প্রতি মুখ তুলিয়া দেখ। লোকে তোমাকে কেন, আমাদেরও নিন্দা করিতেছে। ইহাতে

আমারও মুখ হেট, আমাদের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণেরও মুখ হেট! সেই জন্য বলিতেছি, তোমাকে মদ ছাড়িতেই হইবে।" কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। চারু এই সদুপদেশে একান্ত বিরক্ত হইয়া সজোরে কহিল, "কি, আমার জন্য তোমার মুখ হেট! আর আমি এখানে থাকিতে চাহি না। নিজে উপার্জ্জন করিয়া মদ খাইব তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার জো থাকিবে না।" এই বলিয়া চারু তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করতঃ দ্রুতপদে অন্তঃপুরে গমন করিয়া একেবারে নিজগৃহে উপস্থিত হইল।

কি কথায় কি কথা। শরৎচন্দ্র ত নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ। তিনি আর কি করিবেন, মৌনভাবে অধোবদনে উপবেশন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

(৫)

চারু নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া, প্রথমেই কুসুমকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "কুসুম, আমি চলিলাম।" কুসুম অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কোথায় যাইবে?"

চা। যেখানে দুই চক্ষু যায়; অর্থ উপার্জ্জন চেষ্টায় যাইব।

কু। তোমার এত লোকজন, এত অর্থ, আবার অর্থ কি জন্য ?

চা। নাঃ, এখানে আর থাকা হইবে না। এখানে থাকিতে হইলে পরাধীন হইয়া থাকিতে হয়।

কু। পরাধীন কেন ? তোমাকে কেহ ত' অযত্ন করে না। দিদি, বড়ঠাকুর এঁরা ত' তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন !

চা। আজ দাদার সহিত চটাচটি করিয়া চলিয়া যাইতেছি।

কু। তবে আমাকেও লইয়া চল।

চা। তুমি কোথায় যাইবে ? আমি যাইব চাকুরী করিতে ! কত কষ্ট, কত দুঃখ সহিতে হইবে ; কোথায় থাকিব তাহার কিছুই ঠিক নাই, এ অবস্থায় কি তোমার যাওয়া হয় !

কু। তুমিও যেখানে যাইবে, আমিও সেইখানে যাইব। তুমি পতি—আমি স্ত্রী, তুমি গুরু—আমি শিষ্যা। তুমিও যে কষ্ট পাইবে, আমিও সেই কষ্টের অংশী হইব। আমাকে লইয়া চল।

চা। সে কি হয় কুসুম ! তোমার কি কষ্ট সহ্য হইবে ?

কু। সে কি স্বামিন্! তুমি যদি কষ্ট সহিতে পার, তবে আমি কেন পারিব না? তোমার সুখেই আমার সুখ। যেখানেই থাক, আমাকে কাছে রাখিতে হইবে। আমি তোমার আদেশে জ্বলন্ত অনলেও প্রবেশ করিতে দ্বিধা বোধ করি না।

চারু সব শুনিল, সব বুঝিল। চারু কুসুমকে বেশ চিনিত, চিনিত বলিয়াই বিদায় লইতে আসিয়াছিল। নতুবা এ সময়ে তাহার মনের অবস্থা যেরূপ ভয়ানক, তাহাতে কাহাকেও না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবারই একান্ত ইচ্ছা ছিল। চারু সস্নেহে কুসুমকে কহিল, "তাই হবে কুসুম! যেখানেই থাকি তোমার কাছছাড়া হইয়া থাকিব না। আমি আজ চলিলাম, থাকিবার মত একটা স্থান ঠিক করিয়া তোমায় লইয়া যাইব।" কুসুম কহিল, "স্বামী, প্রভু, জীবিত নাথ! দাসীকে প্রবঞ্চনা করিও না। আমি তোমা ভিন্ন কিছুই জানি না, তোমা ছাড়া কোথাও থাকিতে পারিব না। যেখানেই থাক, আমাকে অবশ্য অবশ্য লইয়া যাইও। তুমি আবার কবে আসিবে?" চারু কহিল, "তিন দিনের মধ্যেই।" তখন কুসুম গললগ্নী-কৃতবাস হইয়া স্বামীকে

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। যখন মাথা তুলিল, তখন দেখিল চারু চলিয়া গিয়াছে। কুসুম স্থির জানিল যে দুই দিন পরে স্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে।

কুসুম প্রভাবতীর গৃহে যাইয়া প্রভাবতীকে, যাওয়ার কথা বলিল। প্রভাবতী এই অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া কুসুমের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "বোন, কি অপরাধ করিলাম যে, আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাই-তেছ? জ্ঞানতঃ ত' কোন দোষ করি নাই।" কুসুম তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, "দিদি, তুমি আমাকে কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়াছ, সোদরাধিক স্নেহ করিয়াছ, তাহা আমি ইহজন্মে ভুলিতে পারিব না। আমি এখন যাইতেছি, আবার আসিব। আশীর্ব্বাদ কর দিদি যেন স্বামীকে সুস্থ করিয়া আবার এই গৃহে ফিরিয়া আসি, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার পতি ভক্তি অচল অটল থাকে, আর যেন স্বামী মতি পরিবর্ত্তন করিয়া সৎপথে আকৃষ্ট হইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসেন।" প্রভাবতী তাহাকে নিরস্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কুসুম মন দৃঢ় করিয়াছে, তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। কাজেই স্বীকৃতা

হইয়া কহিলেন, "যেমনই থাকিস্ বোন, সময়ে অসময়ে পত্র লিখিতে ভুলিস্‌নে।" কুসুম সম্মতা হইল।

(৬)

তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে চারু আসিয়া কুসুমকে কহিল, "চল কুসুম, সব ঠিক করিয়া আসিয়াছি। কলিকাতা সিমলায় বাটী ভাড়া হইয়াছে।" কুসুম পূর্ব্বেই সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল; প্রফুল্লকে কোলে করিয়া প্রভাবতীর পদধূলি গ্রহণান্তে, পৌরজন সকলের নিকট বিদায় লইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল। প্রভাবতী দেবরকে বিরত হইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, শরৎচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু চারুচন্দ্র কিছুতেই শুনিল না। ভ্রাতৃজায়ার ও জ্যেষ্ঠের পদধূলি লইয়া চিরদিনের তরে জন্মভূমি পরিত্যাগ মানসে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল। প্রভাবতী ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রভাবতী কুসুমের সহিত নানাবিধ সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন। চারুচন্দ্র সমস্ত গুছাইয়া লইয়া হাবড়ায় অবতরণ করতঃ একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সিমলায় তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাটীটি একতালা, দুইটি ঘর আছে। একটিতে রন্ধন ও অপরটিতে শয়ন কার্য্য হইয়া থাকে। ধনী লোকের ছেলে, ধনী লোকের মেয়ে, এই ক্ষুদ্র গৃহে আসিয়া প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট বোধ করিত। কিন্তু কি করিবে? ক্রমে সব সহ্য হইয়া গেল। বাটীটি মদনমিত্রের গলির মধ্যে অবস্থিত। ভদ্র-পল্লী দেখিয়া চারু এই খানেই বাসা ঠিক করিয়াছিল। পাঁচ টাকা ভাড়া সাব্যস্ত হইল।

(৭)

দিন যায় দিন রয় না। চারুচন্দ্রেরও দিন যাইতে লাগিল। কুসুম মনে করিয়াছিল যে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে প্রপীড়িত হইয়া চারুচন্দ্রের চরিত্র সংশোধিত হইবে, কিন্তু এক্ষণে সে আশা শূন্যেতেই মিশাইয়া গেল। এখানে আসিয়া চারুর মদ্যপান বৃদ্ধি পাইল বৈ হ্রাস হইল না। প্রথম প্রথম চারু, সঙ্গে যে অর্থ আনিয়াছিল তদ্বারাই সাহা মহাশয়দিগের তহবিল পূরণ করিত; কিন্তু সে আর কতদিন? বৎসরেকের মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইল। দ্বিতীয় বৎসরে চারু কুসুমের অলঙ্কারে হস্ত দিল। কুসুম আর কি করিবে? স্বামীকে বিবিমতে সদুপদেশ প্রদান করিল, কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। বৎসরেকের মধ্যে

কুসুমের অলঙ্কার অন্তর্হিত হইল। তৃতীয় বৎসরে চারু বহু অনুসন্ধানে মাসিক আট টাকা বেতনে একটি সামান্য চাকুরী সংগ্রহ করিল। বেতনের কিছুই সংসার ব্যয়ের নিমিত্ত দিত না, সমস্তই মদ্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ক্রমে আট টাকাতেও কুলাইল না। চতুর্থ বৎসরে চারু গৃহের দুই একটি উপকরণে হস্তার্পণ করিল। তাহাও ছয় মাহার মধ্যে লোপ পাইল। এখন দুই খানি থালা, একটি বাটি, একটি ঘটি ও একটি ছিন্ন শয্যা ভিন্ন কিছুই রহিল না। কুসুম ভীষণ দারিদ্র্যে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিল। প্রফুল্লর জন্যই তাহার চিন্তা, যাহাতে প্রফুল্ল দারিদ্র্যতা ঘৃণাক্ষরে না বুঝিতে পারে, যাহাতে তাহার মনে কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত না হয়, এই চিন্তাই হৃদয়ে অহঃরহঃ জাগরূক রহিল। কুসুম প্রথম প্রথম প্রভাকে পত্র লিখিত, কিন্তু অর্থাভাবে পত্র লেখা বন্ধ হইল। শরৎচন্দ্র দুই একমাস কিছু কিছু অর্থ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনপ্রকার সংবাদ না পাওয়ায় তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। ঘরে মুষ্টি পরিমাণ চাউল নাই, কিন্তু চারু বেতনের একটি পয়সাও সংসারের জন্য রাখে না। ক্রমে অন্নাভাব হইল। খাদ্যাভাবে কুসুমের ও প্রফুল্লর অস্থিচর্ম্ম সার হইল, তথাপি চারুর সে

বিষয়ে দৃষ্টি নাই। কুসুমদের বাটীর পার্শ্বে একঘর তন্তু-বায়ের বাস। তাহাদের বাটীর কর্ত্রী, কুসুমের দুঃখে দুঃখিতা হইয়া, বিস্তর সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। কর্ত্রী তাহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, কুসুমও তাঁহাকে জননীর ন্যায় মান্য করিত। তিনি একবার কুসুমের অবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্তে সাহায্যার্থ কিছু প্রেরণ করেন, কিন্তু কুসুম তাহা গ্রহণ না করিয়া তাহা প্রতিপ্রেরণ করে। কর্ত্রী যখন দেখিলেন যে কুসুম সাহায্য গ্রহণে কিছুতেই সম্মতা নয়, তখন তাহাকে কহিলেন, "কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিদিন সূতা ও বস্ত্র দিয়া যাইব, তুমি তাহা-দ্বারা বস্ত্রে ফুল তুলিয়া আমাকে দিও, পারিশ্রমিক স্বরূপ তুমি অর্থ পাইবে। অগত্যা কুসুম তাহাতে স্বীকৃতা হইল।

(৮)

পূর্ব্বে একখানি বস্ত্রে ফুল তুলিতে কুসুমের দুই তিন দিন, অতিবাহিত হইত, কিন্তু এখন অভ্যাস বশতঃ দিনে দুই খানি করিয়া বস্ত্র শেষ করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। ঐ বস্ত্র কর্ত্রীকে দিয়া কুসুম প্রতিদিন এক টাকা, দেড়টাকা উপার্জ্জন করে। তাহাতে তাহাদের সংসার

বেশ সচ্ছলভাবে চলিয়া যাইতেছে। চারু সমস্তদিন পথে পথেই অতিবাহিত করে, কেবলমাত্র দিবা দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে, এই দুইবার ভোজনার্থ আগমন করিয়া থাকে। আহার সমাপনান্তেই বাটী হইতে চলিয়া যায়। প্রতিদিন প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আগমন করিয়া থাকে; কোন কোন দিন রাত্রি অধিক হইয়াও যায়। কুসুম প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে প্রফুল্লকে আহার করাইয়া, স্বামীর জন্য খাদ্য রাখিয়া ফুল তুলে। পরে স্বামীর আহারের পর তাহার ভোজনাবশিষ্ট তৃপ্তি সহকারে আহার করে। চারুচন্দ্র ক্ষণিকের নিমিত্তও চিন্তা করে না যে সংসারের ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে অথবা কিরূপেই বা হইবে।

প্রফুল্লর বয়স এক্ষণে দশ; কুসুম তাহাকে নিকটবর্ত্তী কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিল। প্রফুল্লর লেখা পড়ায় খুব মনোযোগ। সে নিজ অধ্যবসায় সহকারে পাঠাভ্যাস করিয়া শিক্ষক মহাশয়দিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। প্রফুল্লর লেখা পড়ায় ঈদৃশ মনোযোগ দেখিয়া পুত্রবৎসলা জননীর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। এই দুঃসময়েও কুসুম একটু শান্তি প্রাপ্ত হইল।

(৯)

এইরূপে বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত হইল। ষষ্ঠ বর্ষে, অত্যধিক পরিশ্রমবশতঃ কুসুমের শরীর ভগ্ন হইল। প্রত্যহ একটু একটু জর হয়, কাশিও দেখা দিল। কুসুমের সে কান্তি, সে তেজোময়ী মূর্ত্তি, সে স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ভালরূপ চিকিৎসা নাই, তদুপরি পরিশ্রম প্রায় পূর্ব্বেরই ন্যায়, নতুবা সংসার চলে না। প্রতিবেশীদিগের সাহায্যে কোনরকমে চিকিৎসা হইতেছে। চারুচন্দ্র গৃহে আসিলে প্রতিবেশীগণ তাহাকে সদুপদেশ দান করতঃ স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষার তত্ত্বাবধান করিতে কহিলেন। কিন্তু চারুর সে বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। চারুর এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সকলে তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। ফলে দাঁড়াইল যে চারু গৃহে আসা বন্ধ করিল। কুসুম একে পীড়িতা, তাহাতে স্বামী বাটী আসা বন্ধ করিয়াছে; কুসুমের শরীর দুর্ব্বহ হইয়া পড়িল। দিন আর কাটে না! সে প্রতিদিন রন্ধন করিয়া, পুত্রকে আহার করাইয়া স্বামীর আশায় খাদ্য লইয়া অপেক্ষা করিত। কিন্তু স্বামীর দর্শন নাই। প্রতিদিন খাদ্য নষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইল। জর ক্রমে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ

করিল। কিন্তু পরিশ্রমের কিছুমাত্র হ্রাস নাই। পরিশ্রম না করিলে চলে কৈ ?

(১০)

গৃহে পত্নী পীড়িতা, পুত্র ক্ষুধাতুর, চারু পথে পথে মদ খাইয়া বেড়াইতেছে। গৃহ সংসার, স্ত্রী পুত্র, এ সব প্রায় বিস্মরণ হইয়াছে। মাসাধিক কাল গৃহে যাওয়া বন্ধ। বেতনে ও ভিক্ষায় যাহা পায়, তাহাতে কোন দিন উদর পূরণ হয়, কোন দিন হয় না।

একদিন অপরাহ্ণে অত্যধিক মদ্যপানে, মাদকতায় বিভোর হইয়া, চারু হাবড়ার পুলের উপর মাতলামি করিতেছে, এমন সময়ে কয়েকটি ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে শরচ্চন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিশেষ প্রয়োজনোপলক্ষে সেই সময়ে শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। শরচ্চন্দ্রকে দেখিয়াই চারু "দাদা, দাদা" করিয়া তাঁহার পদধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, "দাদা, একটি টাকা দাও, আমি মদ খাইগে, শ্রীরামপুরে থাকিতে কত টাকা পেতাম, এখন কি একটা টাকাও মদ খেতে পাব না ? তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একটি টাকা মদ খেতে দাও।" শরৎচন্দ্র সোদরের অবস্থা

দেখিয়া স্তম্ভিত! তিনি ঘৃণায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। সমভিব্যাহারীস্থ জনৈক ভদ্রলোক কহিলেন, “শরৎ বাবু, এটি কি আপনার ভ্রাতা? আপনাকে ‘দাদা’ সম্বোধন করিতেছে! লোকটা কি ভয়ানক মাতাল!” শরৎ বাবু উত্তর করিলেন, “এ আমার কেহ নয়; পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে আমাদের পাড়ায় অনেক দিন ছিল। ইহাকে আমি খুব স্নেহ করিতাম। কিন্তু অবশেষে মদ্যপানে আসক্ত হইলে, আমি একদিন ইহাকে তিরস্কার করি, তাহাতে এ শ্রীরাম-পুর পরিত্যাগ করে।”

যদিচ চারুচন্দ্র অত্যন্ত মাতাল হইয়াছিল, তথাপি তাহার একটু একটু জ্ঞান ছিল। শরচ্চন্দ্রের কথাগুলি কর্ণে প্রবেশ হইবামাত্র তাহা হৃদয়ে যাইয়া, নেশা ছুটাইয়া দিল। একে একে চারুর মনে সমস্তই উদিত হইল। গৃহে তাহার প্রাণাধিকা, করুণাময়ী, সরলা পত্নী পীড়িতা, তাহার দারিদ্র্য-প্রযুক্ত ক্লিষ্ট বদন, স্নেহাধিক পুত্র, সে সমস্তই হৃদয়পটে অঙ্কিত হইল। শৈশবকাল,—শৈশবকালের নির্দ্দোষ চরিত্র, স্নেহপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্নেহশীলা মাতৃস্থানীয়া ভ্রাতৃজায়া বিদায়-কালে তাঁহার কাতর অনুরোধ ও বিষাদময়ী মূর্ত্তি,

সমস্তই একে একে স্মরণ হইল। মনে ধিক্কার জন্মিল; ভাবিল, "আমার চরিত্র এতদূর কুৎসিত হইয়াছে, যে, সোদর—মায়ের পেটের ভাই, স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যিনি আমাকে ক্ষণিকের তরে দেখিতে না পাইলে চারিদিক শূন্য দেখিতেন, তিনিও আজ আমার অবস্থা দেখিয়া অম্লান-বদনে কহিলেন, "এ আমার কেহ নহে, পাড়ায় থাকিত মাত্র।" চারু উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "দাদা, দাদা। আজ আমায় ক্ষমা কর! আর আমি জন্মে মদ স্পর্শ করিব না। দাদা গো!——" কথাগুলি শরতের নিকট পৌঁছিল না। তিনি বহু পূর্বে সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। চারু আর স্থির থাকিতে পারিল না। দ্রুতপদবিক্ষেপে, শঙ্কিত হৃদয়ে, কম্পিতপদে সিমলা অভিমুখে যাত্রা করিল।

(১১)

পথে নানা চিন্তা তাহাকে আক্রান্ত করিল। কে যেন তাহাকে বলিয়া দিতে লাগিল, "মূঢ় এখনও যাও, যদি স্নেহশীলা, করুণাময়ী, প্রিয়তমা সরলা স্ত্রীকে বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এখনও যাও, বৃথা কালবিলম্ব করিও না।" যথাসময়ে চারুচন্দ্র তেতুয়ার নিকট উপস্থিত হইল; আশঙ্কা ও উদ্বেলিত হৃদয়, মনে গভীর চিন্তা ও অনুতাপ

—আর তাহার পা উঠিতে চায় না। ভাবনার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই; বিশাল তরঙ্গমালা-বিক্ষিপ্ত মহার্ণব তুল্য, প্রজ্জ্বলিত মহাগ্নিপরিপূর্ণ হোমকুণ্ড সদৃশ তাহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ ও চিন্তায় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। ক্রমে চারু বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস হয় না। বাহিরে কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল নিস্পন্দভাবে কাষ্ঠপুত্তলিকাবং দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "যদি গিয়া দেখি, কুসুম, স্নেহের কুসুম আমাদের ফেলিয়া, আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত এই পৃথিবী হইতে —" চারু আর ভাবিতে পারিল না, দুই ফোঁটা অশ্রু নেত্র বাহিয়া কপোলে পতিত হইল। আবার ভাবিল, "যদি সত্য সত্যই কুসুম চলিয়া গিয়া থাকে, যদি কুসুম চিরদিনের নিমিত্তই পাপ পৃথিবী——তাহা হইলে প্রফুল্লর কি হইল? সেও কি মাতার সহ — " চারু আর ভাবিতে পারিল না; ভয়বিজড়িত ভগ্নকণ্ঠে মৃদু মৃদু ডাকিল "কুসুম, কুসু।" ভিতর হইতে উত্তর হইল "কে?" চারু স্বর চিনিল, সে স্বর অনেকবার শুনিয়াছে, সে স্বর তাহার স্নেহাধিক অভাগা-তনয় প্রফুল্লর স্বর। তিনি আবেগে ডাকিয়া উঠিলেন, "প্রফুল্ল! প্রফু! বাবা আমার,

শীঘ্র দুয়ার খুলিয়া দাও, আর দাঁড়াইতে পারি না যে বাপ ! তোমার হতভাগ্য পাষণ্ড বাপ আসিয়াছে।” প্রফুল্ল স্বর চিনিয়া সত্বরপদে দ্বার খুলিয়া দিল। চারু প্রফুল্লকে ক্রোড়ে করিয়া বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন তাহার মুখচুম্বন করিল। প্রফুল্ল এই প্রথম পিতার স্নেহ ও ভালবাসা প্রাপ্ত হইল, এই প্রথম পিতার ক্রোড়ে উঠিল, এই প্রথম পিতার নিকট চুম্বন প্রাপ্ত হইল। সে কখনও এতটা আশা করে নাই, এতটা আকাঙ্ক্ষা করে নাই। সুতরাং পিতার স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করতঃ দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলিল। চারু দ্রুতপদে কুসুমের কক্ষে প্রবেশ করিল। গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে অত্যাশ্চর্য্য হইয়া গেল। দেখিল, এক কোণে মিটি মিটি করিয়া একটি মৃৎ প্রদীপ অতি মৃদুভাবে আলোক প্রদান করিতেছে। একধারে একটি মলিন ও ছিন্নশয্যায় কুসুম শয়ন করিয়া বস্ত্রে ফুল তুলিতেছে। কুসুম এত শীর্ণা যে শয্যার সহিত মিশাইয়া গিয়াছে; এত দুর্ব্বল যে উঠিবার শক্তি নাই, শয়নাবস্থাতেই বস্ত্রে ফুল তুলিতেছে। একটি করিয়া ফোঁড় দেয়, আরবার ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করে। চারু কুসুমের শয্যাপার্শ্বে যাইয়া ধীরে ধীরে “কুসুম” বলিয়া ডাকিল। কুসুম অতি

ক্ষীণভাবে ক্ষীণহাসি হাসিল। তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। চারু তাহার গাত্রে হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিল, গাত্র অত্যুষ্ণ, বোধ হইল যেন ফলকে ফলকে বহ্নি বাহির হইতেছে। চারু অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কুসুম, তোমার এত অসুখ, তথাপি পরিশ্রম করিয়া ফুল তুলি-তেছ কেন?" প্রফুল্ল তাহার কোল হইতে বলিল, "নহিলে আমরা খাব কি? ঐ কাপড় দিয়া তবে পয়সা পাওয়া যায়।" চারু উঠিল। প্রফুল্ল বলিল, "কোথা যাচ্চ বাবা!" চারু উত্তর কারল, "ডাক্তার ডাকিতে।" কুসুম দুই হস্তে চারুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে দিল ও সঙ্কেতে ডাক্তার আনিতে নিষেধ করিয়া গৃহের এক কোণ দেখাইয়া দিল। চারু সেদিকে তাকাইল, কিন্তু বুঝিতে পারিল না। প্রফুল্ল বলিল, "মা তোমাকে খাবার খাইতে বলিতেছেন।" চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কে রাঁধিল?" প্রফুল্ল বলিল, "মা-ই অতি কষ্টে রাঁধেন, আর প্রতিদিন তোমার খাদ্য লইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি একদিনও আস না, সে সব খাবার নষ্ট হয়।" চারু ঊর্দ্ধহস্তে জগৎপাতাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কুসুম, তুমিই ধন্যা! আমি এতদিন তোমায় চিনিতে না পারিয়া

হেলায় হারাইয়াছিলাম। তোমাকে চিনিয়াও চিনি নাই, এই আমার বড় দুঃখ রহিল। না জানি তোমায় কত কষ্টই দিয়াছি।" কুসুম আবার চারুর পদধূলি গ্রহণ করিল। কিন্তু চারু আর সেখানে দাঁড়াইল না; দ্রুতপদে রাজপথে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। যখন হেদুয়ার নিকট উপস্থিত হইল, তখন শরৎচন্দ্র সেই স্থান দিয়া কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই চারু,"দাদা। দাদাগো,সর্ব্বনাশ হইয়াছে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পদধূলি গ্রহণান্তে অকপটচিত্তে সমুদয় বিবৃত করিল। তখন উভয় ভ্রাতা একখানি 'হ্যাকনি ক্যারেজ' ভাড়া করিয়া কলিকাতার মধ্যে যিনি সুচিকিৎসক তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সমস্ত বলিয়া তৎক্ষণাৎ আসিতে অনুরোধ করিলেন। তিনিও কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগের সহিত যথাসময়ে আসিয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "খুব সময়ে আপনারা আমাকে ডাকিয়াছেন, যদি আর দুইদিন বিলম্ব করিতেন, তাহা হইলে বাঁচান দুঃসাধ্য হইত।" শরৎচন্দ্র বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, যত টাকা ব্যয় করিতে বলেন করিব,

রোগিণীকে সুস্থ করিতেই হইবে।” চিকিৎসক তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া রীতিমত চিকিৎসা ও ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সেই দিবস রাত্রেই শরৎচন্দ্র শ্রীরামপুরে যাইয়া প্রভাকে লইয়া আসিলেন। প্রভাবতী কুসুমের অবস্থা দর্শনে কাঁদিয়া অস্থির। সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তাঁহারা সকলে পরমপিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক কুসুমের যথারীতি সেবাশুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের শুশ্রূষাগুণে কুসুমের মৃতদেহে জীবন সঞ্চারিত হইয়া, পূর্ব্বকান্তি, পূর্ব্বসৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া আসিল। চারুর মতি পরিবর্ত্তন হইল। সে প্রফুল্লর মস্তকে হস্ত সংস্থাপন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে আর মদ্য স্পর্শ করিবে না। কুসুম সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে সকলেই আনন্দচিত্তে চিকিৎসককে আশাতিরিক্ত পুরস্কৃত করিয়া শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

আবার পূর্ব্বের মত সোনার হাট সংসার বসিল।

(৪ঠা মাঘ ১৩০৮।)

প্রতিফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবানন্দপুরের প্রথিত নামা জমীদার, বাবু সীতানাথ মুন্সীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ললিতমোহন এবার 'এল্. এ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় থাকিয়া প্রেসীডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়িতেছে। পিতা মাতার আনন্দের আর সীমা নাই। পল্লীগ্রামে "ছেলে বি. এ. পড়ে" কথাটা বড় সহজে যায় না। দিনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ সাত বার কথাটা লইয়া তোলা পাড়া হইয়া থাকে। সীতানাথ বাবু একে ধনী জমিদার, তাহাতে ছেলে বি. এ পড়িতেছে——ইহাত' সোনায় সোহাগা! সকলের মুখেই ললিতের প্রশংসা অহর্নিশি শুনিতে পাইবে। স্বার্থের জন্যই হউক, অথবা নিঃস্বার্থ ভাবেই হউক, প্রতিদিন অন্ততঃ দুই পাঁচজন লোক সীতানাথ বাবুর নিকটে আসিয়া সুমধুর বচনে বলিয়া যাইত, "ললিতমোহনের মত ছেলে

বড় একটা হয় না।" এই সমস্ত শুনিয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতা মনে করিতেন, "ছেলে আমাদের বাঁচিলে হয়!"

ললিতমোহন সীতানাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র; কনিষ্ঠ কিশোরীমোহন ব্যতীত ললিতের অপর ভ্রাতা কিম্বা ভগ্নী নাই। ললিতের বয়স হয় নাই এমন নহে - শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, ললিত গত চৈত্র মাসে পঁচিশ বৎসরে পা দিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তাহার শুভ-পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। পাঠক পাঠিকারা যদি কেহ থাকেন—মনে করিতে পারেন, "বড় লোকের ছেলে, দুই দুইটা পাশ করিয়াছে, বয়স হয় নাই এমনও নয়, তথাপি অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই কেন?" বিবাহ না হইবার একটু কারণ ছিল। সীতানাথ বাবু একটু কৃপণ-স্বভাবাপন্ন ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক। তাহার অমতে কাহারও—এমন কি গৃহিণীরও—কোন কার্য্য করিবার অধিকার ছিল না। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন; অপ-রের পরামর্শ লইতে তিনি নিতান্তই নারাজ। একবার যে বিষয়ে "না" বলিয়াছেন, শত চেষ্টা করিলেও তাহা আর "হাঁ" হইবার নহে। সেকেলে লোক বলিয়া গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে একটু ভয় করিত।

ললিত যে বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই বৎসর তাহার বিবাহের জন্য একবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু সীতানাথ বাবু অবিচলিত ভাবে উত্তর দেন, "ললিত এখন ছেলে মানুষ, ইহার মধ্যেই বিবাহ দিলে পড়াশুনার ক্ষতি হইতে পারে।" সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে,সে বিষয়ে সীতানাথবাবুর ততটা লক্ষ্য না থাকুক, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, ছেলে যখন বি. এ. পড়িবে তখন তিন সহস্র মুদ্রা নগদ ও চারি সহস্র মুদ্রার অলঙ্কার গ্রহণ পূর্ব্বক সম্ভ্রান্তবংশীয়া কোন জমিদার-তনয়ার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়া সুখী হইবেন। তিনি গৃহিণীকে আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আর দুই দিন পরে ছেলের বিবাহ দিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবেক, সুতরাং এত দিনের পর তাঁহার সাধের হীরার বালা হইবার বড়ই সম্ভাবনা। তাহারা এইরূপ আশার প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া কতই সুখমোহন স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেন। একবারও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই যে, অভিপ্সীত কর্ম্মের অন্তরায় যথেষ্ট।

অয়ি কুহকিনী আশা, তুমি এই মরুভূমিময় সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া প্রতিদিন প্রতিক্ষণ জন মাত্রেরই

হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা হইয়া শোণিত পান করিতেছে। তুমিদেবী না রক্ত-পিপাসু পিশাচী! আমি তোমায় বিলক্ষণ জানি। তুমি কতদিন কত সময়, আমার এই চির দুঃখ পূর্ণ হৃদয়-মরুতে অবতীর্ণা হইয়া কখনও বা আমাকে রাজা করিয়াছ, কখনও বা আমাকে পথের ভিখারী করিয়া চ'খের-জলে নাকের-জলে করিয়াছ। আবার কখনও বা স্বর্গে তুলিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করাইয়া পরক্ষণেই পূতিগন্ধ পরিপূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর নরকে নিক্ষেপ করিয়াছ। তোমার ইহাতেই সুখ, ইহাতেই আনন্দ। ইহাই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম! কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া এই নিরীহ বেচারীদের উপর আধিপত্য কর কেন? বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের উপরই তোমার আধিপত্য বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একে তাহারা অন্নাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় প্রপীড়িত হইয়া মৃত্যুকে সসম্মানে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহার উপর তুমি তাহাদের "উঠ্ ব'স্" করাইয়া আরও ক্ষুধার বৃদ্ধি করাইয়া থাক। তাই বলি, অয়ি কুহকিনী আশা! তুমি আমাদের নিকট কি আশা কর, প্রকাশ্যভাবে বল, আমরা তোমাকে ষোড়শোপচারে পূজা দিতে প্রস্তুত আছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেলে থাকিয়া ললিতমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ পড়িতেছে। হিন্দু হোষ্টেলের প্রায় সকল ছেলের সহিত ললিতমোহন পরিচিত; বিশেষতঃ হিরণকুমার মজুমদার নামে একটি বালকের সহিত তাহার আন্তরিক ও অকপট বন্ধুত্ব। উভয়েই একশ্রেণীর ছাত্র, উভয়েই শান্ত ও শিষ্ট। তাহাদের মধ্যে কেহই ক্ষণকালের নিমিত্ত অপরের কাছ-ছাড়া হইতে ইচ্ছা করিত না। শয়ন, ভোজন, ভ্রমণ, অধ্যয়ন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই তাহারা একত্রে করিত। মোট কথা তাহারা যেন উভয়ে হরিহর-আত্মা।

হিরণকুমারের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দ্রহাটা নামক একটি পল্লীগ্রামে। হিরণকুমার পিতৃহীন। তাহার পিতা স্বর্গীয় নবগোপাল মজুমদার "কমিশারিয়েটে" চাকুরী করিয়া বিস্তর নগদ টাকা ও একমাত্র আত্মজ হিরণকুমারকে রাখিয়া প্রায় দুই বৎসর হইল ইহ সংসারের মায়া কাটাইয়া পবিত্রধামে গমন করিয়াছেন। হিরণকুমারের মাতা চন্দ্রহাটীতেই থাকেন। হিরণকুমার মধ্যে মধ্যে

ললিতকে সঙ্গে লইয়া মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইত। তাহার মাতা ললিতমোহনকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেন, "হে ঈশ্বর আমার দু'টি ছেলেই যেন হাকিম হয়।" বস্তুতঃ তিনি ললিতকে স্বীয়া পুত্রাপেক্ষাও স্নেহ করিতেন। ললিতও হিরণকে দেবানন্দপুরে লইয়া যাইতে ছাড়িত না; এই সমস্ত কারণে তাহাদের আত্মীয়তা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

পূজার ছুটীর আর তিন সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব আছে! ছাত্রবৃন্দের "পূজার ছুটী" একটি মস্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু; সুতরাং এ তিন সপ্তাহ তাহাদের পক্ষে যেন আর কাটিতেছে না। ছাত্র মাত্রেই বাটী যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে; আমাদের ললিতমোহন ও হিরণকুমারও যে হয় নাই এমন নহে। কিন্তু তাহাদিগকে পূজার ছুটীর একমাস যে কাছছাড়া হইয়া থাকিতে হইবে এই ভাবিয়াই তাহারা আকুল হইল। ইহা যেন তাহাদের পক্ষে অসহ্য বলিয়া বোধ হইল।

একদিন অপরাহ্লে হিরণ বলিল, "ভাই ললিত, এবার পূজার ছুটির সময় আমাদের দেশে চল।" ললিত বড় বুদ্ধিমান, সে হাসিয়া বলিল, "না ভাই! তুমি বরং

আমাদের ওখানে চল।" হিরণ ললিতের প্রস্তাবে ও ললিত হিরণের প্রস্তাবে সহজে স্বীকৃত হইল না। উভয়েই উভয়কে নিজের দেশে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ও বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিল। অবশেষে ললিতমোহন সকল দিক বজায় রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি প্রথম পনর দিন তোমার দেশে যাইতেছি, তুমি অবশিষ্ট পনর দিন আমাদের বাটীতে থাকিবে কিনা বল।"

হিরণকুমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তৎপরে উভয়ে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিবার পর হিরণকুমার ললিতের পিতাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিল ঃ

কলিকাতা
ইডেন হিন্দু হোষ্টেল।
৩রা আশ্বিন।

শ্রীচরণেষু—

কিয়দ্দিবসাবধি আপনাদিগের কুশল সংবাদ অপ্রাপ্তে চিন্তিত আছি, আপনাদিগের কুশল সংবাদ জানিতে নিতান্ত মানস।

আগামী ২৮শে আশ্বিন তারিখে আমাদের কলেজ বন্ধ হইবে। আমার ও পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর একান্ত বাসনা যে ললিত পূজার ছুটীর প্রথম কয়েক দিন আমাদের বাটীতে থাকে। তৎপরে তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইব। আপনার ইহাতে মত আছে কিনা জানিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত লিখিয়া জানাইলে সুখী হইব। আমি ও ললিত ভাল আছি। আমার শত কোটী প্রণাম জানিবেন ও পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীকে জানাইবেন।

শ্রীচরণে নিবেদন মিতি—
আপনার স্নেহের
"হিরণ"।

যথা সময়ে সীতানাথ বাবু লিখিয়া পাঠাইলেন যে, হিরণের যখন ইচ্ছা হইয়াছে ললিতকে তাহার বাটীতে লইয়া যাইবে, তখন তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; তবে যেন ললিত সেখানে বেশী দিন বিলম্ব না করে। পত্র খানি পাইয়া তাহারা অদ্ভূত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এমনই করিয়া বাকী সপ্তাহ তিনটা কাটিয়া

গেল। কলিকাতার সমস্ত কালেজ ও স্কুল সমূহ বন্ধ হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে হিরণকুমার ললিতমোহনের সহিত সমস্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া পৌনে দুইটার ট্রেণে চন্দ্রহাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণের মাতা তাহাদের দুইজনকে পাইয়া অতীব আনন্দিতা হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দিন যেমন যায়, যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটীর বার দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। এই কয়দিন তাহাদের বড় সুখেই কাটিল।

একদিন প্রত্যুষে ললিতমোহন শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিল যে হিরণকুমার তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত। শয়ন করিতে অধিক রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া ললিতমোহন তাহাকে জাগ্রত না করিয়াই হস্তমুখ প্রক্ষালন মানসে ধীরে ধীরে নিকটস্থ পুষ্করিণী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুষ্করিণীতে তখনও লোক সমাগম হয় নাই। পুষ্করিণীটি তত বড় না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়; দুই ধারে দুইটি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বাঁধা ঘাট, ও অপর দুইধার সুপারি

গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত। একটি ঘাট পুরুষ ও অপরটি স্ত্রী-লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রভাতকাল; এখনও অল্প অল্প অন্ধকার রহিয়াছে। আকাশে এখনও দুই একটি প্রভাতী-তারা দেখা যাইতেছে; মৃদু মৃদু বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; উষাকালের মৃদু প্রবাহিত শীতল সমীরণ হিল্লোলে নীলাম্বর প্রতিভাত নীলজলরাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয়ে শোভা পাইয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যাইতেছে।

ললিতমোহন পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল,——

"আমি চিনিগো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনী,——"

গান আর গাওয়া হইল না।

পুষ্করিণীর অপর তীরে ধীরে ধীরে দশম বর্ষীয়া পরমা-সুন্দরী একটি বালিকা কতকগুলি বাসন লইয়া পুষ্করিণীর জলে আসিয়া নামিল। আ মরি মরি! বালিকার কি অপরূপ রূপ; দেখিলেই মনে হয় বিধি যেন নির্জ্জনে বসিয়া সমুদয় সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া ঐ প্রতিমাখানি, সৃজন করিয়াছেন। বালিকার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সৌন্দর্য্য যেন

ফুটিয়া বাহির হইতেছিল এবং সেই সৌন্দর্য্য ঊষার অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অলৌকিক শ্রীধারণ করিয়াছিল। ললিতমোহন সেই রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। অনিমেষনয়নে বালিকার দিকে তাকাইয়া তাহার সেই সুন্দর মুখখানি, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ ও বায়ু-হিল্লোলে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত আলুলায়িত কেশপাশ দেখিতে লাগিল। যতই দেখে, ততই তাহার দর্শন লালসা বাড়িতে থাকে। পোড়া নয়ন আর অন্যদিকে ফিরিতে চায় না!

বালিকা আপনার কার্য্যগুলি একে একে সম্পন্ন করিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। তখনও ললিতমোহন সেইরূপ ভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে যে পথ দিয়া বালিকা চলিয়া গিয়াছে, সেই পথের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এইরূপ ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলে একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবশেষে অনন্যমনে বাটীর দিকে গমন করিল।

সেইদিন হিরণকুমার দেখিল, ললিতমোহন বড়ই অন্যমনস্ক। একবার ডাকিলে তাহার উত্তর পাওয়া যায় না। দুই চারিবার ডাকার পর চমকিত হইয়া কচিৎ উত্তর

দেয় ও ছল ছল দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। স্নানাহারে বড় স্পৃহা নাই; কাহারও সহিত বড় একটা কথা কয় না। উদাসভাবে সদাই যেন কি ভাবিতেছে। হিরণকুমার অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইল না।

অপরাহ্ণে হিরণকুমার ললিতকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হইল। ললিত নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিরণের অনুরোধে যাইতে বাধ্য হইল। উভয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে পবিত্রা জাহ্নবী মাতার তীরে আসিয়া একটি বেলাখণ্ডে উপবেশন করিল। এখনও ললিতমোহন পূর্ব্বের ন্যায় অন্যমনস্ক। হিরণকুমার বুঝিল "গতিক ভাল নহে"। জিদ্ করিয়া ললিতকে জিজ্ঞাসার উপর জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, "তোমার কি হইয়াছে ভাই, বলিতেই হইবে। কেহ কি তোমাকে কিছু বলিয়াছে? না বাটী যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে।" ললিতমোহন সংক্ষেপে উত্তর দিল, "না।" কিন্তু হিরণকুমার সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে; বিশেষতঃ সে সম্প্রতি Bainএর Logic পড়িতেছে! একথা, সেকথা, নানা কথার পর আসল কথা বাহির করিয়া লইয়া উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল,

"ওঃ হরি! এর জন্যই এত! আমি না জানি কি কাণ্ডই ঘটেছে! তুমি বুঝি কালীবাবুর মেয়ে কমলকে দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছ!" ললিতমোহন অনিচ্ছা সত্বেও তাহার গুপ্তকথা বাহির হইয়া গেল দেখিয়া বড়ই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইল; অথচ স্পষ্ট স্বরে কহিল, "ভাই হিরণ, যখন সমস্তই জানিতে পারিলে তখন আর লুকাইয়া কি হইবে? ভাই তোমাকে বলিতে কি—তাহার সহিত যদি আমার বিবাহ হয় তবেই আমি বিবাহ করিব, নতুবা এ জনমে আর কাহাকেও এ হৃদয়ে স্থান দিতে পারিব না। তাহার সহিত বিবাহ না হইলে আমার চির জীবনটা চির-দুঃখেই অতিবাহিত হইবে।"

হিরণকুমার বিদ্রূপ ব্যঞ্জক হাস্য করিয়া কহিল, "ব্যস্! এক নিশ্বাসে যে বাঙ্গালা নভেলের সারত্বটুকু ব'লে ফেল্লে হে! কি ভায়া Court-Ship পর্য্যন্ত 'The end' হ'য়ে গেছে নাকি! তোমার মুখের কাছে Reinold এবার স্থান পান কিনা সন্দেহ! তা ভাই, তখন দেখব, আর কাউকে, হৃদয়ে স্থান দিতে না পেরে একেবারে মস্তকে স্থান দিয়ে ব'সে আছ; একবার নামাইতেও ইচ্ছা হবে না!"

ললিতমোহন এই বিদ্রূপ-বাণে কিছুমাত্র বিদ্ধ না হইয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে কহিল, "না ভাই হিরণ, ঠাট্টা নয়! আমি তোমাকে যথার্থ কথাই বলিয়াছি; আমার আর কাহাকেও বিবাহ করিবার ইচ্ছাও নাই, করিবও না। ওখানেই যাহাতে বিবাহ হয় তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।"

হিরণকুমার অনেক ভাবিয়া বলিল, "বিবাহ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। একে উহাদের তত পয়সা নাই; দুই ভাই কালী রায় ও বিষ্ণু রায় যৎসামান্য যাহা উপার্জ্জন করে তদ্বারা উহাদের সংসার খরচই ভালরূপ কুলায় না। তাহাতে উহারা নিজে 'মৌলিক' হইয়া মৌলিকের ঘরে বিবাহ দিয়া সমাজে হীন হইয়া পড়িয়াছে; তদ্ভিন্ন আবার তোমরাও "কুলীন" নহ; এরূপ অবস্থায় তাহার সহিত তোমার বিবাহ কিরূপে হইতে পারে? হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। বিশেষতঃ তোমার পিতার যে 'গাঁই' ও তিনি যে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু তাহাতে তিনি কখনই এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না।"

ললিত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আচ্ছা, উহারা আমার সহিত বিবাহ দিবে কিনা বলিতে পার?"

হিরণ হাসিয়া উত্তর করিল, "হ্যাঁঃ, তোমার মত পাগল ত' কখন দেখিনি! উহারা তোমার মত জামাতা পাইলে ত' বাঁচে। এমন বড় লোকের ছেলে, এমন বিদ্বান্—বিদ্বান ব'লে বিদ্বান, দুটো দুটো পাশ করা বিদ্বান!—এমন সুপুরুষ, এমন —— "

ল। থাক্, তোমার আর 'এমন' এ কাজ নাই। উহারা সম্মত হইলেই হ'ল। Then I don't care anything at all; তাহা হইলে আমি যেমন করিয়া পারি ঐ কমলকেই বিবাহ করিব। যেমন করিয়া পারি পিতা মাতাকে সম্মত করাইব। পিতা যদি সম্মত না হন, তাহা হইলে আমি পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, সমুদয় পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

হিরণ। ছিঃ ললিত, এত অধৈর্য্য হইও না। সকল দিক ভাবিয়া তবে কার্য্য করিও। ছেলে মানুষের মত——

ললিতমোহন সে কথায় বাধা দিয়া কহিল, "তুমি আজই কালী বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার মনোভাব তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বল। তাঁহারা যদি স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আগামী কল্যই আমি বাটী যাইয়া পিতার নিকট সবিশেষ কাহিনী বর্ণনা করিব।

পিতা যদি এ বিষয়ে সম্মত হন ভালই, নতুবা আমি তাঁহা-দিগের নিকট চিরদিনের মত বিদায় লইয়া, কমলকে জীবনের চির সঙ্গিনী করিয়া একটু চাকুরী গ্রহণ পূর্ব্বক সামান্য কুটীরে কালাতিপাত করিব। তাহাতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার শান্তি।"

হিরণকুমার ললিতমোহনকে বিস্তর বুঝাইল, অনেক আপত্তি প্রদর্শন করাইয়া দৃঢ় সংকল্প হইতে বিরত হইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ললিতমোহন পূর্ব্বের ন্যায় অচল ও অটল। কুবুদ্ধি ঘটিলে মানুষের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে।

হিরণকুমার অবশেষে পরাজিত হইয়া তৎপরদিবস প্রাতঃকালে কালী বাবুদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল। তাঁহারাত' এরূপ মক্কেল পাইলে বাঁচেন ; সুতরাং সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

সেই দিন অপরাহ্নে হিরণকুমার ললিতমোহনের সমভি-ব্যাহারে নৌকাযোগে দেবানন্দপুর আসিয়া উপস্থিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"তুমি ভাই আগে বল।"

"না ললিত তুমি বুঝিতেছ না; আগে তোমার বলাই শ্রেয়ঃ।"

"না, তা' কথনই হ'তে পারে না। তুমি অগ্রে প্রস্তাব কর, তাহার পর আমি আমার পক্ষ সমর্থন করিব, তথন তোমার ওকালতি করিবার আবশ্যক হইবে না।"

"তুমিত' ছাড়িবে না, ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা ডালা ত' আছিই! তবে কালকে সকালে বলিয়া দেখা যাইবে, কিন্তু তোমাকে আমার সহিত থাকিতে হইবে।"

"তা থাকব, তাহাতে শর্ম্মা ভয় করেন না। কিন্তু আবার কাল সকালে কেন? আজই যাওয়া যাক্ চল; কথাতেই ত' আছে 'শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণং'; What you have to do, must do to day and not tomorrow. এই দেখ না, দশ, দশ দিন এখানে আসিয়াছি, আজ ব'লব, কাল ব'লব ক'রে বলা আর হয় না। বলিতে যাইলেই কেমন মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তাই

আজ স্থির করিয়াছি যাহা হয় আজ একটা হবে। আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়।”

হিরণকুমার সম্মত হইল। তখন দুই জনে শঙ্কিত হৃদয়ে, কম্পিত পদে, হৃদয়ে দারুণ সন্দেহ লইয়া ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, সীতানাথ বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিল।

হিরণকুমার ও ললিতমোহন চন্দ্রহাটী পরিত্যাগ করিয়া আজ দশদিন হইল দেবানন্দপুরে আসিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি মুখ ফুটিয়া সীতানাথ বাবুর নিকট তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। বলিতে যাইলেই কেমন একটা শঙ্কা ও লজ্জা আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিত। তাই আজ ললিতমোহন হৃদয়ে বল বাধিয়া, স্বীয় পাঠগৃহে হিরণের সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাহার সমভিব্যাহারে সীতানাথ বাবুর নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিল।

চল পাঠক, আমরাও চুপি চুপি যাইয়া বাহির হইতে উঁকি দিয়া কি কাণ্ডটা আজি ঘটে দেখিয়া আসি।

সীতানাথ বাবু শয়ন করিয়াছিলেন; ললিতমোহন ও হিরণকুমার ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া উপবেশন করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া সীতানাথ বাবু উঠিয়া বসিলেন এবং সস্মিত বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি খবর

হিরণ ? কেমন এখানে মন টিকিতেছে ত’ ? হিরণ উত্তর করিল, “আজ্ঞে হাঁ।”

সীতানাথ বাবু আর কিছু না বলিয়া হস্তস্থিত “হিতবাদী” খানিতে মনঃ সংযোগ করিলেন।

তখন দুই বন্ধু পরস্পর পরস্পরের মুখের প্রতি তাকাইয়া নীরব ভাষায় নীরবভাবে এক গুপ্ত পরামর্শ করিয়া ফেলিল ; তাহাদের নয়নে নয়নে এক প্রকার Telegraph (টেলিগ্রাফ) খেলিয়া গেল, সে কার্য্য কেহ দেখিল না, সে ভাষা কেহ বুঝিল না।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে হিরণকুমার গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সীতানাথ বাবুর নিকট আস্তে আস্তে আসল কথা পাড়িল ও সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। সীতানাথ বাবু স্থির কর্ণে সমুদায় শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ রূক্ষ স্বরে কহিলেন, “মৌলিক হইয়া মৌলিকের ঘরে পুত্রের বিবাহ দিয়া শেষ বয়সে কি জাত হারাইব ? না, এ বিবাহ কখনই হইবে না।” ললিত কহিল “ওখানে আমার বিবাহ না দিলে আমি আর কখনও বিবাহ করিব না। ঐ মেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিতেই হইবে।” সীতানাথ বাবু অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন,

"লল্‌তে, দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া কি তুই একেবারে অধঃপাতে গিয়াছিস্‌। আমি তোর পিতা, আমার সাক্ষাতে দাঢ্যভাবে নিজের বিবাহের কথা বলিতে কি তোর একবারও লজ্জা বোধ হইল না। ইংরাজী পড়ার দোষই ত' ওই! দুই পৃষ্ঠা ইংরাজী পড়িয়াছিস্‌ বলিয়া কি সমাজের প্রতি তোর একটুও ভয় নাই!

ল। Hang your সমাজ। Free love এ কিছুমাত্র দোষ নাই।

সী-বাবু। ইংরাজী পড়ার দোষই ত' ঐ! আমি ওখানে বিয়ে কখনই দিব না।

ল। আপনাকে দিতেই হবে; আর আমি করিবই।

সী-বাবু। কিঃ—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোমার এতবড় স্পর্দ্ধা; আমাকে আজও চেন' নাই? এখনই আমার সমস্ত বিষয় আশয়ের উত্তরাধিকারী হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিলাম। আমার সংসারে, আমার গৃহে তোমার আর স্থান নাই। তুমি আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হও। ক্ষমতা থাকে তুমি স্বচ্ছন্দে বিবাহ করগে, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার ত্যজ্য পুত্র।

"আচ্ছা" বলিয়া ললিতমোহন দ্রুতপদে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। হিরণকুমার প্রমাদ গণিল। সে, সীতানাথ বাবুকে শান্ত হইবার জন্য এবং ললিতমোহনের এই বালক-সুলভ প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবার জন্য বিস্তর সানুনয় বিনয় করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সীতানাথ বাবুর মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকের ক্রোধাগ্নি সহজে নির্ব্বাণ হইবার নহে; তাহা অন্তরে অন্তরে ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতে থাকে।

সেই দিন সকলে শুনিল যে সীতানাথ বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিতমোহনকে ত্যজ্যপুত্র করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র কিশোরীমোহনকে সমস্ত বিষয়-আশয় উইল করিয়া দিয়াছেন।

গৃহিণীত' কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির। বৃদ্ধা বয়সে তিনি বড়ই শোক পাইলেন।

সেই প্রিয় জন্মভূমি, সেই পরিচিত আম্রকানন—যাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া ললিত একদিন অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিত, স্বহস্ত রচিত সেই সুন্দর পুষ্পোদ্যান—যাহার সুমিষ্ট পুষ্পরাশির সৌগন্ধে তাহার মন প্রাণ বিমোহিত হইত, সেই ঘোষেদের কপিল গাভী, সেই শস্যক্ষেত্র, সেই অনন্ত

প্রবাহিনী কল কল নিনাদিনী ভাগিরথী—অপরাহ্নে যাহার কূলে বসিয়া সে একদিন স্বর্গসুখ অনুভব করিত, সেই সমস্ত প্রিয় বস্তু—যাহাদের দর্শনে তৃপ্তি, শ্রবণে প্রীতি, স্মরণে অনন্ত শান্তি—সেই সমস্ত প্রিয় বস্তুর নিকট চির-কালের নিমিত্ত বিদায় লইয়া ললিতমোহন বড় দুঃখেই হিরণকুমারের সহিত চন্দ্রহাটীতে তাহাদিগের বাটীতে গমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ ২রা অগ্রহায়ণ। কালী বাবুর কন্যা কমলের সহিত ললিতমোহনের বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার বিবাহ।

ললিতমোহনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পড়িয়া হিরণ-কুমার এই বিবাহে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছে; কিন্তু তাহার মানসিক অবস্থা বড় ভাল নহে। কে যেন স্পষ্ট ভাবে তাহাকে বলিয়া দিতেছে যে, এ বিবাহের পরিণাম বড় শোচনীয়; কে যেন চুপি চুপি তাহার কর্ণকুহরে বলি-তেছে যে, এ বিবাহে কেহ সুখী হইতে পারিবে না! কিন্তু

সে কি করিবে? তাহার আর অপরাধ কি? তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সে বহু পূর্ব্বেই সম্পাদন করিয়াছে।

পাঠক, ললিতমোহনের মানসিক অবস্থা এখন কিরূপ বলিতে পার কি? একবারও ভাবিতে পার কি? তাহার মনের অবস্থা এখন কিরূপ বলা দূরের কথা, চিন্তা করাও বড় কঠিন। পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের অমতে যে বিবাহ করিতেছে-- তাহাতে কি, সে, এক দণ্ডের নিমিত্তও সুখী?

দিবাবসানের সহিত গ্রামস্থ দু'একজন ভদ্রব্যক্তি হিরণ-কুমারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ইঁহাদিগকে 'বরযাত্র' যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। হিরণ-কুমার তাঁহাদিগকে বিশেষ আপ্যায়িত করিল।

সন্ধ্যার অনতিবিলম্ব পরেই হিরণকুমার পাত্র ও বর-যাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া কালীবাবুর বাটী যাইয়া উপস্থিত হইল। বাজনা বাদ্য বড় একটা বাজিল না।

কালীবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা বিষ্ণুবাবু তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া বসাইলেন; বাটীর ভিতরে একটা ঢোল ও একখানা কাঁশি ঢিমে তেতালায় বাজিতে লাগিল। শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে বিবাহবাটী সরগরম হইয়া উঠিল।

ক্রমে লগ্নের সময় সমুপগত হইলে কালীবাবু ও তস্য সহোদর বিষ্ণুবাবু উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে পাত্রকে বিবাহ আসর হইতে উঠাইয়া প্রচলিত প্রথানুযায়ী স্ত্রী-আচারাদি সম্পন্ন করাইয়া পাত্র ও পাত্রীকে দান গৃহে লইয়া আসিলেন। বিষ্ণুবাবু কন্যা উৎসর্গ করিবেন; সুতরাং তিনি শুদ্ধাচারে তর্কনিধি পুরোহিত মহাশয়ের সহিত পূর্ব্ব হইতেই সেই গৃহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রকোষ্ঠটি বড় ক্ষুদ্র; স্থান সংকুলান হইবে না বলিয়া হিরণকুমার ও উপস্থিত অপরাপর ভদ্রমহোদয়গণ বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

যথারীতি মন্ত্র পাঠ আরম্ভ হইল। বিষ্ণুবাবু ললিতমোহনের জানুদেশ স্পর্শ করিয়া পাত্রী সম্প্রদান করিলেন এবং ললিতমোহন যথারীতি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া দান গ্রহণ করিল। পুরোহিত মহাশয় তখন বর ক'নেকে শুভদৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ করিলেন। একখানি পট্টবস্ত্র উভয়ের মস্তকের উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল। চারি চক্ষু মিলিত হইবামাত্র ললিতমোহন শিহরিয়া উঠিয়া, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং অতি মাত্রায় স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। "সর্ব্বনাশ!

এত' সে মেয়ে নয়! যাহাকে দেখিয়া সে একদিন বিমো-হিত হইয়া গিয়াছিল, যাহাকে পাইবার আশায় সে পিতা মাতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার স্থানে কিনা এক ঘন কৃষ্ণবর্ণা, শীর্ণকায়া, উচ্চ দন্তা, অতীব কুরূপা কন্যার সহিত বিবাহ হইল!" ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল এবং সে মনে মনে বলিতেছিল "হে বসুন্ধরে! তুমি বিদীর্ণা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি!!!"

বলা বাহুল্য, যে কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইল সে কন্যা কালী বাবুর নহে, তাঁহার ভ্রাতা বিষ্ণু বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

ললিত আর সে স্থানে কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া হিরণকে সবিশেষ বর্ণনা করিয়া কহিল, "ভাই হিরণ! পিতামাতার অবাধ্য হইয়া আজি উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইলাম। এ সংসারে আমার কি-না ছিল?—পরম পূজ্য পিতামাতার অযাচিত স্নেহ, প্রাণা-ধিক সহোদরের পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধন, অপরিমিত ধনরাশি, অসংখ্য দাসদাসী, প্রিয় পরিজন প্রতিবাসী—আমার কি-না ছিল? কিন্তু আজ আমার সব গেছে; আজ আমি সব

হারায়েছি ; তুচ্ছ আকাঙ্খা, তুচ্ছ প্রলোভনের বশীভূত হইয়া সব হারাইয়া আজ আমি পথের ভিখারী হ'য়েছি। দাঁড়াইবার জন্য সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানও আজ আমার নাই ; আজ আমার 'আমিত্বের' লোপ পাইল। আজ আমি হাতে হাতে প্রতিফল পাইলাম।"

চ'খের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুই চারি ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ডদেশ অতিক্রম করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

ললিতমোহন ধীরে ধীরে কোথায় চলিয়া গেল ; তদবধি তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পাঠক! দুর্গম গিরিকন্দরে, সুদূর প্রান্তরে, নিবিড় কাননে কিম্বা লোকালয়ে কখনও কি তাহার দেখা পাইয়াছ ?

(১৮ই ভাদ্র ১৩০৯।)

দরিদ্রের ঐশ্বর্য্য।

বড় বেশী দিনের কথা নয়।

তখন আমি মুঙ্গেরে ডিষ্ট্রিক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত ছিলাম।

সে দিন রবিবার; সকাল হইতে অনবরত বৃষ্টি হইতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় বসিয়া আফিসের কাগজ পত্র দেখিতেছি এমন সময়ে দরজায় হাঁক পড়িল, "বাবু, বাবু।" "এই বৃষ্টিতে কে ডাকে" ভাবিয়া উঠিলাম; এবং দরজা খুলিয়া দেখিলাম যে, একজন সাহেব বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সাহেবের পোষাক-পরিচ্ছদ মলিন ও স্থানে স্থানে ছিন্ন। দেখিলেই বোধ হয় সাহেবের আজকাল বড়ই দৈন্য-দশা। ওরূপ অবস্থায় সাহেবকে দেখিয়া আমার বড়ই দয়া হইল। বলিলাম,

"মহাশয়! যদি আপত্তি না থাকে তাহা হইলে আমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন।" অবশ্য ইংরাজী ভাষাতেই কথোপকথন হইয়াছিল। সাহেব আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বোধ করি আমার অনুমতি দিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না, সাহেব আপনা হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সাহেবকে শুষ্ক বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিলাম। সাহেব বাঙ্গালী-সাজে সজ্জিত হইয়া পকেট হইতে একটি বর্ম্মাই চুরুট বাহির করিয়া ধূম পানে রত হইলেন।

সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম যে, তাহার নাম জর্জ্জ্ ফার্ণাণ্ডি। ১০।১৫ বৎসর হইল সুদূর ইংলণ্ড হইতে প্রবাসে আসিয়াছেন। বড় গরীব; একটা 'মিলে' (কলে) যৎসামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন, আজ সপ্তাহ-খানিক হইতে তাহাও গিয়াছে। সমস্ত দিন আহার হয় নাই—কতদিন হইবে না তাহারই বা স্থিরতা কি? সাহেব সুখ-দুঃখের অনেক কথা কহিলেন। আমি তাহার স্বভা-বের একটি বৈলক্ষণ্য প্রথম হইতেই নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিলাম। মাঝে মাঝে সাহেব বড়ই অন্যমনস্ক হইয়া যান। আমার একজন Assistantএর (সাহায্যকারী)

বড়ই প্রয়োজন ছিল, কাজ কিছুই শক্ত নয়। সুতরাং সাহেবকে কহিলাম, "সাহেব, আপনার অবস্থা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, আপনি আমার আফিসে কার্য্য করিবেন?" সাহেব এই প্রস্তাবে যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, এবং বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বাবু, আপনার এই বদান্যতায় অতীব আপ্যায়িত হইলাম; আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ; ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" আমারই বাসার দুইটি ঘর সাহেবকে ছাড়িয়া দিলাম ও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলাম।

জর্জ্জ বড়ই ভদ্রলোক ও কর্ম্মপটু। তাঁহাকে Assistant স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমারও কার্য্যের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। আমার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাহেবেরও বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলাম। ক্রমে সাহেবের বেশ সচ্ছল অবস্থা হইল। জর্জ্জ্ একাকী; তাঁহার স্ত্রী পুত্র কেহই নাই। জর্জ্জ্ বলেন এ সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে দ্বিতীয় নাস্তি। সাহেবের সচ্ছল অবস্থা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্যমনস্কতা কিছুতেই যাইল না। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও, ইহার কিছুই কারণ দেখিতে পাই

নাই। সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেও ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। একদিন আমরা সকলে সাহেবকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করি। বিবাহের নাম শুনিয়া সাহেব একটি সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বড়ই অন্যমনস্ক হইয়া যান। তাঁহার এবম্প্রকার ভাব নিরীক্ষণ করিয়া আমরা নিরস্ত হই। কিন্তু কারণ জানিতে বড়ই উৎসুক হইয়া রহিলাম।

সাহেব, ধনী লোকের সহিত বড় একটা মিশিতে চাহিতেন না। দরিদ্র দেখিলেই তাঁহার অন্তঃকরণ দয়াতে পরিপূর্ণ হইত। তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন, অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন ও বিস্তর সাহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। বাঙ্গালীদের উপর সাহেবদের যে একটা বীতরাগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, জর্জ্জের তাহার লেশ মাত্রও ছিল না। নীচান্তঃকরণ ও নীচবংশীয় মহাপ্রভুদেরই বাঙ্গালীদের উপর বংশানুগত জাতক্রোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদিচ জর্জ্জ্ আমার অধীনে কার্য্য করিতেন, তথাপি তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া আমি তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিতাম। একত্রে অবস্থানের নিমিত্ত তাঁহার সহিত আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে জর্জ্জের গৃহের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম যে জর্জ্জের হস্তে একখানি ক্ষুদ্র আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফ্)। জর্জ্জ্ সেখানির প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। চক্ষের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার ঔৎসুক্যতা আরও প্রবল হইল। আমি জর্জ্জের অনুমতি না লইয়াই তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলাম, "জর্জ্জ্!" আমাকে দেখিয়াই জর্জ্জ্ বড়ই অপ্রতিভ হইলেন ও তাড়াতাড়ি আলোক-চিত্রখানি ও অশ্রুধারাগুলি লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। আমি বলিলাম, "জর্জ্জ, বন্ধুর ন্যায় আমি দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, উত্তর দিবেন কি?" জর্জ্জ্ কহিলেন, "অটলবাবু (আমার নাম অটলকুমার দে) আপনি আমার প্রভূত উপকার করিয়াছেন; এ জনমে আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। আপনার নিকট কিছুই গোপন করিব না; জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" আমি কহিলাম, "জর্জ্জ্! আপনার হস্তে যে আলোকচিত্রখানি ছিল, যাহাকে দেখিয়া আপনি এতক্ষণ ক্রন্দন করিতেছিলেন, সে চিত্রখানি কাহার? চিত্রখানি দেখিয়া আপনি ক্রন্দন করিতে-

ছিলেন কেন? মধ্যে মধ্যে আপনাকে বড়ই অন্যমনস্ক হইতে দেখিতে পাই কেন? যে দিন আপনাকে বিবাহ করিতে আমরা অনুরোধ করি, সে দিন আপনি একটি সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অনন্যমনা হইয়া যান কেন? যদি আপত্তি না থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কয়টির যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করিলে বড়ই উপকৃত হইব।" জর্জ্জ্, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বিচলিত হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,

"সে আজ অনেক দিনের কথা।

ইংলণ্ডের গিল্ড্‌ফোর্ড্ সহর আমার জন্মভূমি। ঐ সহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে মেরী ও তাহার পিতা আল্‌ফ্রেড্ বাস করিতেন। মেরী সবে মাত্র যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। যৌবন সমাগমে তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গোলাপ ফুলের ন্যায় সৌন্দর্য্য ক্রমশঃই প্রস্ফুটিত হইতেছে। আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় লাজভরে সদাই যেন ঢলঢল করিতেছে; তাহার আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশ-পাশ ভূমি চুম্বন করি-তেছে। মেরী অনুপমা সুন্দরী।

আমি প্রতিদিন প্রভাতে একাকী ৫।৬ মাইল পথ ভ্রমণ করিতাম। একদিন ঐ নিরুপমা সুন্দরী মেরী আমার নয়ন-পথের-পথিক হইল। উভয়েই যৌবন-তরঙ্গে ভাসমানা, সুতরাং ক্ষণিকেই আমাদের হৃদয় বিনিময় হইয়া গেল। ভালবাসা আমাদিগকে পাগল করিল। আমি প্রত্যহ সেইস্থানে গমনাগমন করিতে লাগিলাম। দেশকাল-পাত্র ভুলিয়া পরস্পরে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে স্থির-সঙ্কল্প করিলাম। আমি মেরীকে কহিলাম, "আমি বড় গরীব; তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহাহইলে সুখী হইতে পারিবে না; আমার এমন স্থান নাই যে, তোমাকে লইয়া একত্রে বাস করি, এমন অর্থ নাই যে, তোমার আমার উভয়ের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয়; অতএব আমাকে বিবাহ করা তোমার কর্ত্তব্য নয়।" কিন্তু মেরি ইহাতে বড়ই দুঃখিতা হইল; কহিল, "জর্জ্জ্! আমি তোমার অর্থ বা অবস্থাকে বিবাহ করিতেছি না; তোমাকেই বিবাহ করিতেছি। সুতরাং তোমার অবস্থার সহিত বিবাহের কোন সম্বন্ধই নাই।" আমি দেখিলাম, মেরী আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, আমিও তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতাম। একদিন চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া আমরা

পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। এমনি করিয়া কিছুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন মেরী কহিল, "আর এমন করিয়া কত দিন যাইবে? আমার বড় ইচ্ছা যে, একবার শ্বশুর বাটী গমন করি; আমাকে লইয়া চল। তুমিও যেখানে থাকিবে, আমিও সেইখানে থাকিব।" আমি তাহাকে আমার দৈন্যদশা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অগত্যা সপ্তাহবাদে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলাম।

সেদিন পূর্ণিমা; পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সুদূরাম্বরে উদিত হইয়া শুভ্র জ্যোৎস্নায় জগৎ প্লাবিত করিতেছিলেন। মলয় পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। উবাভ্রমে পিকবর কুহুতানে প্রাণ আকুল করিতেছিল। আমি দুইটি অশ্ব সংযুক্ত একখানি শকট লইয়া মেরীর গৃহে উপস্থিত হইলাম। মেরী পূর্ব্ব হইতেই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আমি যাইতেই পিতার নিকট বিদায় লইয়া শকটে আরোহণ করিল। আমি অনর্থক শকট ভাড়া করিয়াছি বলিয়া একটু স্নেহপূর্ণ তিরস্কারও করিল। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম "প্রথম শ্বশুর

বাটী যাইতেছ, পদব্রজে যাওয়া ভাল দেখায় না।" দ্রুত-গতিতে শকট চলিতে লাগিল। কত বাড়ী, কত লোক-জন অতিক্রম করিয়া অবশেষে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বারদেশে প্রবেশ করিল। অট্টালিকাটি বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় সুশোভিত হইয়া এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়া-ছিল; চতুর্দ্দিকে লোহিত, পীতবর্ণীয় পতাকাসমূহ পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছিল ও নানা বর্ণীয় পুষ্পসমূহে পরিশোভিত হইয়াছিল। মেরী জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাটী কাহার?" আমি কহিলাম "লর্ড্ ডিকেন্সের।" মেরী কহিল "লড্ ডিকেন্সের এই বাটী? লড্ ডিকেন্সের নাম শুনিয়াছি বটে; মস্ত বড় লোক। গিল্ড্ফোর্ড্ সহরে লর্ড্ ডিকেন্সের নাম কে-না শুনিয়াছে! ডিকেন্সের ন্যায় ধনীলোক ইউরোপে আর নাই।" শকট ক্রমে সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ লোক দণ্ডায়-মান হইয়া অবনতমস্তকে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। আমাদের শকট প্রাসাদে প্রবেশ করিবামাত্র সুম-ধুর স্বরে মঙ্গলগীত ও বাদ্যগীত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল। পৌরজনেরা সত্বর আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল। এই সমস্ত সন্দর্শনে মেরী যুগপৎ অত্যাশ্চর্য্য ও বিস্মিতা

হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামিন্! আমাদের শকট এই স্থানে কি জন্য আসিল আর এই সমস্ত লোক সসম্ভ্রমে আমাদিগকে এত অভ্যর্থনাই বা করিতেছে কেন? আমাদের অবস্থা হীন; সেই নিমিত্ত আমাদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই কি এত সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা?" কিন্তু মেরীর সে ভ্রম সত্বরেই বিদূরিত হইল। ক্ষণপরেই সে জানিতে পারিল যে তাহার স্বামী নিতান্ত দরিদ্র লোক নয়। সে আজ প্রসিদ্ধ ধনী লর্ড্ ডিকেন্সের গৃহিণী। বলা বাহুল্য, আমার প্রকৃত নাম জর্জ্জ্ ফারনাণ্ডি নহে; আমিই গিল্ড-ফোর্ড সহরের সুপ্রসিদ্ধ ধনী লর্ড্ ডিকেন্স্।

যথাসময়ে মহাসমারোহে আমাদের বিবাহ জনসাধারণে প্রচারিত হইল। মেরী আমার সুবৃহৎ প্রাসাদের একমাত্র অধিশ্বরী হইয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু কৈ! মেরীর সে পূর্ব্ব প্রফুল্লতা, সদা হাস্যযুক্ত বদন, সেই চিরবিকশিত স্বর্গীয় কান্তি কোথায় গেল?

মেরীর এত ঐশ্বর্য্য সহ্য হইল না। সে দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আজীবন দরিদ্র-গৃহেই প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, দরিদ্র জানিয়াই দরিদ্র স্বামীকে বিবাহ করিয়াছে, সুতরাং তাহার এত ধনরত্ন, এত মানসম্ভ্রম,

এত ঐশ্বর্য্য ভাল লাগিবে কেন? সে আমাকে প্রায়ই বলিত, "এত ঐশ্বর্য্য আমি কিরূপে সহ্য করিব? আমার কুটীরই ভাল লাগে। আহা! যেরূপ দরিদ্র জানিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, যদি সেইরূপই দরিদ্র হইতে তাহা হইলে কি সুখের সংসারই হইত'!" আমি ভাবিতাম, "কালে, মেরীর সমস্ত অভ্যাস হইয়া যাইবে। তখন আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিবে।" কিন্তু হায়! সে আশা শূন্যেতেই অন্তর্হিত হইল। দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, মাসের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি তাহার সে দোষ সংশোধিত হইল না। মুখে সেই এক কথা "আহা! যদি তুমি দরিদ্র হইতে!" দিন দিন মেরী কৃশ হইতে লাগিল। আহারে রুচি নাই, বিহারে সুখ নাই, শয়নে তৃপ্তি নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই। মুখে সেই এক কথা "এত ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারি না; আহা! তুমি যদি তোমার বর্ণনানু-যায়ী নিঃস্ব হইতে!" মেরীর আগমনের কিয়দ্দিন পরেই মেরীর পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং তাহার পিতৃগৃহেও যাইবার উপায় ছিল না। ক্রমে মেরীর পীড়া দেখা দিল। পীড়া ক্রমে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পরিণত হইল। প্রথমাবস্থা

হইতেই চিকিৎসা করান হইতেছিল ; কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসকেরাও রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। সকলেই বলিলেন, "পীড়া মানসিক ; চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না।" অবশেষে মেরী মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা হইল। আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। অনবরত আমার অশ্রু-ধারা মেরার উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। মেরী আমাকে বিস্তর বুঝাইল, অনেক সান্ত্বনা বাক্য প্রদান করিতে লাগিল ; কিন্তু আমার হৃদয়ে তখন যে অগ্নি জ্বলিতেছিল তাহা সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ ব্যতীত আর কে বুঝিবে ! ক্রমে মেরীর অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। অন্তিমকালে মেরী কহিল, "স্বামিন্ ! আমার শেষ অনুরোধ আর দুঃখ করিও না। আমার অন্তিম সময়ে আর অধৈর্য্য হইও না। জন্মজন্মান্তরে যেন তোমাকে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হই। এ সময় আর অধৈর্য্য হইও না। হৃদয়ে বল বাঁধ। ঐ যে গোলাপী রংয়ের পরিচ্ছদটি রহিয়াছে, ঐ পরিচ্ছদটি চিনিতে পার কি ? ঐটিই পরিধান করিয়া প্রথম এই বাটীতে পদার্পণ করি ; সে আজ দশ বৎসর। আমার

অন্তিম অনুরোধ সহাস্যবদনে ঐ পরিচ্ছদটি আমাকে এক্ষণে পরিধান করাইয়া দাও, সহাস্যবদনে তোমার অঙ্কে মস্তক রাখিয়া জনমের মত এই বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাই।" আমি সজল নয়নে সেই পরিচ্ছদটি - দশ বৎসর পূর্ব্বের সুখশান্তি বিজড়িত পরিচ্ছদটি—মেরীকে পরিধান করাইয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কত সুখপূর্ণ পূর্ব্বস্মৃতি, স্মৃতিপথে উদিত হইল। হায়! দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই একদিন, আর আজি একদিন! সত্য সত্যই সেইক্ষণেই আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া হাসিতে হাসিতে সতী সাধ্বী মেরী আমাকে চিরজীবনের নিমিত্ত কাঁদাইয়া নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যধামে গমন করিল। তদবধি আমি পথের ভিখারী।"

এই দুঃখপূর্ণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া সজল নয়নে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি যে জর্জ্জের কক্ষ শূন্য; জর্জ্জ নাই। সেই দিন হইতে আর জর্জ্জের কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

(৭ই মাঘ ১৩০৯।)

তিরস্কার।

(১)

সুশীল কুমারের জননী দেবীর বড় ভয় পাছে সুশীল কুমার ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধ কুমার তাহাদের পিতামাতার অবর্ত্তমানে সম্পত্তি সকল বিভাগ করিয়া ভিন্নভাবে কালাতিপাত করে। তিনি একান্নবর্ত্তী পরিবারের বড়ই পক্ষপাতী, সুতরাং তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা তাহার দুই পুত্র চিরজীবন যাহাতে সদ্ভাবে একত্রে বাস করে। এজন্য তিনি এবিষয়ে তাহাদের প্রায়ই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

সুশীলের পিতা একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তিনি গৃহে থাকিয়া বিষয়-আশয় দেখেন ও তাঁহার দুই পুত্র সুশীল কুমার ও সুবোধ কুমার কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করে। দুই ভ্রাতায় বড় সদ্ভাব, উভয়ে শান্ত ও শিষ্ট। পিতা

মাতার উপদেশ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাহারা জীবন-মার্গে অগ্রসর হইতেছে।

সুশীল কুমার এইবার প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে ও সুবোধ কুমার পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। একদিন প্রাতঃকালে সুশীল তাহাদের কলিকাতাস্থ বাসা-বাটীতে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, এমন সময়ে একটি দীন, দরিদ্র ও অনাথ আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। অন্নাভাবে তাহার দেহ জীর্ণ, ক্ষুধায় তাহার আসন্ন-কাল উপস্থিত হইয়াছে। তৈলাভাবে তাহার মস্তকে জট বাঁধিয়াছে; তাহার বহুদিনের মলিন বসনখানি শতধা ছিন্ন হইয়াছে। লোকটিকে দেখিয়া তাহার কোমল হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল ও অন্তঃকরণ দয়াতে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু সুশীলের হস্তে তখন অর্থ ছিলনা। সুতরাং সে বাধ্য হইয়া সুবোধের নিকট হইতে একটি টাকা কর্জ্জ লইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রদান করিল। সে দান তামসিক নয়, সে দানে স্বার্থ ছিলনা, সে দানে অহঙ্কার, দাম্ভিকতা বা বাহিকতা নাই। সে দান সাত্ত্বিক দান। সে দান কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না। জানিল শুধু দাতা, জানিল শুধু গৃহীতা, আর জানিলেন শুধু সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পিতা

পরমেশ। দরিদ্র আশাতিরিক্ত লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দুই হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

(২)

যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ও গ্রীষ্মাবকাশ প্রাপ্ত হইয়া সুশীল ও সুবোধ বাটী প্রত্যাগমন করিল। পিতা মাতার স্নেহ ও যত্নে তাহারা সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ উপভোগ করিতে লাগিল। বালকেরা চির পাঠ্যজীবন প্রবাসে পিতা মাতা, আত্মবন্ধু বিচ্ছেদ হইয়া অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রাণপণে কষ্ট করিয়া যে দুরূহ জীবন অতিবাহিত করে, গ্রীষ্মাবকাশে ও পূজার ছুটীতে ২।১ মাসের জন্য সুখশান্তি বিজড়িত আবাসে আসিয়া পিতামাতার স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে বসিয়া সেই সমস্ত কষ্টের অপনোদন করিয়া থাকে।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে সুশীলকুমার সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনের আনন্দের সীমা রহিল না।

দেখিতে দেখিতে অবকাশের দুই মাস পূর্ণ হইয়া গেল। সুশীল ও সুবোধ কলিকাতায় প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইল। নয়টা বাজিয়াছে, আর অর্দ্ধঘণ্টা পরেই গাড়ী আসিবে। এমন সময়ে সুবোধ বলিল, "দাদা, সেই টাকাটি

এখন দিবে?" সুশীলের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের টাকা রে সুবোধ?" সুবোধ কহিল "দাদা আমার নিকট হইতে ধার লইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া মাতা সুশীলকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "ছিঃ! ছোট ভাইয়ের নিকট হইতে কি বলিয়া ফাঁকি দিয়া লইলে! একটুও কি লজ্জাবোধ হইল না। ছিঃ-ছিঃ ছিঃ!" সুশীল কহিল, "না মা! আমি ফাঁকি দিই নাই, এখনই টাকা দিতেছি। সুবোধ এতদিন টাকা চাহে নাই বলিয়া ও আমারও মনে ছিল না বলিয়াই এতদিন দিতে পারি নাই।" কিন্তু মাতা স্পষ্টই বুঝিলেন যে সুশীল এখন হইতেই ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং তিনি তাহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন। অন্যায়রূপে তিরস্কৃত হইয়া যথাসময়ে সুশীল সজল নয়নে ভ্রাতার সহিত বাটী হইতে বিদায় হইল। কে জানে সুশীলের সেই শেষ বিদায় কিনা।

(৩)

বিমর্ষহৃদয়ে ও ভগ্নান্তঃকরণে সন্ধ্যার সময় তাহারা কলি-কাতায় পৌঁছিল। বাসায় আসিয়াই সুশীল তাহার মাতাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিল :—

"শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু—

মা! অন্যায় তিরস্কারে তিরস্কৃত হইয়া বড় দুঃখেই সমস্ত পথ বিমর্ষহৃদয়ে ও বিদীর্ণান্তঃকরণে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সুবোধকে তাহার টাকা প্রত্যার্পণ করিয়াছি, সেজন্য আপনার কোন চিন্তা বা সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই জানিবেন। বড় দুঃখ রহিল যে "আমার ফাঁকি দিবার কিছুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না" সে কথা আপনাকে বিশ্বাস করাইতে পারিলাম না। আপনা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছি বলিয়া আমার এখন আর কিছুমাত্র কষ্ট নাই, কারণ পুত্রকে মাতা তিরস্কার না করিলে আর কে করিবে? কিন্তু বিনাপরাধে লাঞ্ছিত হইয়াছি বলিয়া প্রথমে যে একটু কষ্ট অনুভূত হইয়াছিল, এখন সে কষ্টও নির্ব্বাণ হইয়াছে। কারণ আমি জানি অদৃষ্টদোষে আপনারা ত' আমার উপর সদাই বিরক্ত আছেন। যাহা হউক সে জন্য আর দুঃখ করিয়া কি করিব? মা! 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়'। আমার কি অপরাধ ক্ষমা করিবেন না? বোধ করি আমি যদি সুবোধের অন্তরায় হইয়া না জন্মাইতাম, তাহা হইলে আপনারা সুখী হইতেন! ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে

প্রার্থনা করি যেন সেই অন্তরায় হইতে আমাকে সত্বরেই অন্তর্হিত করেন। সুবোধ ভাল আছে। আমার সংখ্যাতিরিক্ত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীচরণে বিদায়।

আপনার চিরহতভাগ্য পুত্র
শ্রীসুশীল কুমার।"

সেইদিন, রাত্রে সুশীলের প্রবল জ্বর হইল। পরদিন সুশীল যখন শয্যাত্যাগ করিল, তখন তাহার চক্ষু দুইটি করমচার ন্যায় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেখিয়াই বোধ হইল, যেন শরীরের সমুদয় রক্ত নয়নদ্বয়ে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এবম্প্রকার অবস্থা দেখিয়া সুবোধ বড়ই ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তারকে আনয়ন করিল। রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সুশীলের অসাক্ষাতে সুবোধকে কহিলেন, "এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া কঠিন।"

যথাসময়ে সুশীলের পত্রখানি পাইয়া পুত্রবৎসলা স্নেহময়ী জননীর হৃদিতন্ত্রী কি এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব অনিশ্চিত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সুশীলের পিতামাতা তৎক্ষণাৎ

সন্দিগ্ধহৃদয়ে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনু-
শোচনায় তাঁহাদের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

কলিকাতার ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, একখানি অশ্বযান ভাড়া করিয়া গাড়োয়ানকে গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশ করিয়া সুশী-
লের পিতা কহিলেন, "দ্রুত হাঁকাও, বক্‌শিস মিলিবে।" পুরস্কার প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া শকট চালক প্রাণ-
পণে গাড়ি হাঁকাইয়া গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিল। শকট হইতে অবতরণ করিয়া যেমন তাঁহারা বাটীর দ্বারে প্রবেশ করিবেন, পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল, "বল হরি হরিবোল।"

পরিচিত কণ্ঠে এই মর্ম্মভেদী ধ্বনি শুনিয়া সুশীলের মাতা তখনই মুর্চ্ছিতা হইলেন।

(১৩ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩১০।)

সমাপ্ত।

মৎপ্রণীত অপর গ্রন্থ—

কোরক (গীতিকবিতা) যন্ত্রস্থ।

বৃন্ত (গীতিকবিতা)

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেক।

শ্রীভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।